ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং মানবিক প্রশিক্ষণ

লেখক : হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ড. মাওলানা আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ (কাতিফ)
অনুবাদক : হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আলহাজ্জ মাওলানা মো. আলী মোর্তজা (বাংলাদেশ)

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)
এবং
মানবিক প্রশিক্ষণ

লেখক
হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ড. মাওলানা আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ (কাতিফ)

অনুবাদক
হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আলহাজ্জ মাওলানা মো. আলী মোর্ত্তজা (বাংলাদেশ)

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং মানবিক প্রশিক্ষণ

মূল ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন
ড. মাওলানা আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ (কাতিফ)

ভাষান্তর ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আলহাজ্জ
মাওলানা মো. আলী মোর্ত্তজা (বাংলাদেশ)

সম্পাদক ঃ মোঃ ইকবাল

প্রকাশনায় ঃ আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতানী, খুলনা, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০২১ খ্রিঃ

কম্পোজ ঃ মো. মুন্তাজার মাহ্দী

প্রচ্ছদ ঃ আব্দুল লতিফ

মূদ্রণ ঃ .....

কপি ঃ .....

মূল্য ঃ .....

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

সূচীপত্র

০১	প্রকাশকের কথা	০৭
০২	ভুমিকা	০৮
০৩	অনুবাদকের কথা	১০
০৪	উৎসর্গ	১৫
০৫	ইমাম সাজ্জাদ এবং দোয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	১৬
০৬	সাহিফা সাজ্জাদিয়া এবং দোয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	১৮
০৭	দোয়ার প্রভাব	২২
০৮	দোয়া কবুল হওয়ার শর্তাবলী	২৪
০৯	ক) আল্লাহর মা'রেফাত অর্জন করা	২৪
১০	খ) আল্লাহর বিধি-বিধান মান্য করা	২৪
১১	গ) আন্তরিকভাবে চাওয়া	২৪
১২	ঘ) হালাল রুজি উপার্জন ও ভক্ষণ করা	২৫
১৩	ঙ) ইখলাস এবং নিষ্ঠার সাথে দোয়া করা	২৫
১৪	চ) সঠিক এবং উপযুক্ত সময়ে দোয়া করা	২৭
১৫	দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ	২৮
১৬	ক) গোনাহ	২৮
১৭	খ) অন্যের উপর জুলুম এবং অত্যাচার করা	২৮
১৮	গ) ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ না করা	২৮
১৯	ঙ) হারাম খাওয়া	২৮
২০	চ) আল্লাহর ইচ্ছা	২৯
২১	যে সকল দোয়া অবশ্যই কবুল হয়	২৯
২২	ক) নেক সন্তানের জন্য বাবার নেক দোয়া এবং খারাপ সন্তানের জন্য বাবার বদ দোয়া	২৯
২৩	খ) জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের বদ দোয়া	২৯
২৪	গ) মু'মিনের জন্য মু'মিনের দোয়া	২৯
২৫	ঘ) যে অধিক কোরআন তিলাওয়াত করে তার দোয়া	৩০
২৬	ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং দাসদের প্রশিক্ষণ	৩০
২৭	ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং দাস-দাসী	৩১
২৮	দাস-দাসীদের সাথে সদাচার	৩২
২৯	ক) দাসদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ	৩২
৩০	খ) দাসীদের সাথে বিবাহ করা এবং তাদের থেকে সন্তান নেয়া	৩২
৩১	গ) দাসদের ক্ষমা করে দিতেন	৩৪
৩২	দাস-দাসীদের মুক্ত করে দিতেন	৩৬
৩৩	ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং ফকিরদের সাহায্য সহযোগিতা	৩৭

৩৪	ক) ফকিরদের সম্মান করা	৩৭
৩৫	খ) ফকিরদের সাথে সদাচার	৩৭
৩৬	গ) গরিবদের সাথে নমনীয় আচরণ	৩৭
৩৭	সাহায্য প্রার্থিকে (ভিক্ষুক) কখনোই তাড়িয়ে দিতেন না	৩৮
৩৮	দেনাদারের দেনা পরিশোধ করা	৩৮
৩৯	গরিবদের গণহারে খাওয়াতেন	৩৮
৪০	গরিবদের দায়িত্ব নিতেন	৩৯
৪১	গোপনে সাহায্য করা	৩৯
৪২	ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর রিসালাতুল হুকুক গন্থ	৪১
৪৩	ইমাম সাজ্জাদ এবং মানবাধিকারের মূল ভিত্তসমূহ	৪১
৪৪	রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থের বৈশিষ্ট এবং মর্যাদা	৪২
৪৫	মৌলিক অধিকারসমূহ	৪৩
৪৬	রিাসলাতুল হুকুক এবং সমাজের ন্যায় ও ইনসাফ	৪৪
৪৭	গ্রন্থপঞ্জি	৪৬
৪৮	লেখক পরিচিতি	৪৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি। (সূরা তিন-৪)

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং মা'বুদ। অসংখ্য দরুদ ও সালাম মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের উপর।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ইসলামকে যেসকল পন্থা ও কৌশলে জনগণের কাছে প্রচার করেছেন তার মধ্যে মানুষের মানবিক প্রশিক্ষণ, দোয়া এবং ইবাদতের সংস্কৃতি ছিল অন্যতম একটি মাধ্যম। তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বহু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চিত্তাকর্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সেসব দোয়া সাহিফায়ে সাজ্জাদিয়া নামক একটি সংকলনে বিধৃত হয়েছে।

আল্লাহর অত্যধিক ইবাদত বন্দেগীর কারণে বিশ্বনবীর (সা.) আহলে বাইতের সদস্য এ মহান ইমাম যাইনুল আবেদীন বা ইবাদতকারীদের অলংকার উপাধি পেয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ ও সিজদায় রত থাকতেন বলে তিনি সাজ্জাদ নামেও পরিচিত ছিলেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) কারবালার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কারবালা বিপ্লবের প্রকৃত ঘটনা ও শিক্ষা প্রচারের পাশাপাশি ইসলাম বিরোধী নানা চিন্তা ধারার মোকাবিলায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করতেন ইমাম সাজ্জাদ। তিনি মানুষের নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে কিভাবে মুসলমানদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায় তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এ সকল বিষয়সমূহ হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ড. আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফের কলমে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি অত্যান্ত চমৎকারভাবে ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর প্রশিক্ষণের বিষয়টি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। আর তার প্রচেষ্টাকে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন মির্জা আসকারী সাহেব উর্দুভাষায় সাবলীলভাবে অনুবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আলহাজ মাওলানা মোহাম্মাদ আলী মোর্ত্তজা সাহেব এ মূল্যবান গ্রন্থটি চমৎকারভাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে তা এ ভাষাভাষী মু'মিন মোমেনাতের নিকট পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমি মহান আল্লাহর নিকট তাঁদের সকলের সার্বিক উন্নতি ও আরও বেশী খেদমত করার তৌফিক কামনা করছি।

বিনীত
মোহাম্মদ ইকবাল
১০ জামাদিউস সানি, ১৪৪২ হিজরি, ২৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

ভুমিকা

ইমাম আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব হযরত সাইয়্যেদ সাজ্জাদ আলাইহিস সালাম। (৩৮ হিজরি -৯৫ হিজরি)। তিনি ইমামতি ধারার চতুর্থ ইমাম এবং আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য। যাঁদের থেকে মহান আল্লাহ সকল প্রকার অপবিত্রতা দূর করেছেন। (সূরা আহযাব-৩৩)

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তাঁর ইমামতকালে সকল মুসলমানের জন্য জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি ইসলামী শরীয়তের সঠিক বর্ণনাকারী এবং কুরআনের মুফাসসিরও ছিলেন।

তিনি ছিলেন ইবাদত-বন্দেগি, সংযম এবং তাকওয়া পরহেজগারিতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ও আদর্শ।

আর এ জন্যই তাঁকে সাইয়্যেদুস সাজেদিন তথা সিজদাকারীদের সরদার, যাইনুল আবেদিন তথা ইবাদতকারীদের অলঙ্কার, মুত্তাকি ও পরহেজগারদের নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তাঁর সারা জীবনে অনেক তিক্ত ঘটনা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন যার মধ্যে কারবালার ঘটনা সব থেকে বেশী কষ্টদায়ক এবং হৃদয়বিদারক ছিল। আর এর প্রভাবও এতটাই কষ্টদায়ক ও তিক্ত ছিল যে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) সারা জীবন তা ধৈর্য ও হিকমতের সাথে স্মরণ করে গেছেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ৬১ হিজরিতে তাঁর মহান পিতা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন সময়ের সম্মুখীন হন এবং সকল সমস্যা ও প্রতিকুল পরিবেশকে উপেক্ষা করে ইমামতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে সঠিক ও নিপুণভাবে পালন করেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এমন এক সময়ে ইমামতের দায়িত্ব পালন করছিলেন যে, তখন আর ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছিল না বরং অনৈসলামিক সংস্কৃতির চর্চা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা মুসলমানদের ইসলামী জীবনধারাকে পাল্টে দিয়ে তাদেরকে অনৈসলামিক জীবনধারার দিকে ধাবিত করছিল।

অপর বিষয়টি হচ্ছে তখন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পতন ঘটেছিল এবং সমাজে খারাপ কাজের প্রচলন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর তখনকার মানুষ অধিকমাত্রায় দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে দুনিয়ার মোহে বিভোর করে তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ, আচার অনুষ্ঠান এবং আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া।

এমন পরিস্থিতিতে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) কারবালার ঘটনার পর সমাজের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির জন্য সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় এবং ইসলামী সুশিক্ষার প্রচার শুরু করেন। তিনি পাশাপাশি এমন ছাত্র ও শিক্ষক তৈর করলেন যারা সমাজকে সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এছাড়াও তিনি সমাজের যারা জ্ঞানী শ্রেণীর লোক ছিলেন তাদের জন্যও উপযুক্ত খোরাক দিলেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর প্রশিক্ষণ ও খেদমতের মানদণ্ড ছিল মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং সঠিক ইসলামী প্রশিক্ষণ দান করা। কেননা উম্মতের উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে মানুষের সুশিক্ষা ও সঠিক প্রশিক্ষণ মুখ্য ভুমিকা পালন করে।

মনুষ্য সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিস্তারে ইমাম সাজ্জাদের যে ভুমিকা তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ইমাম সাজ্জাদ (আ.) যে সকল বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন তার কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

১। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ (দোয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ)
২। মানবিক প্রশিক্ষণ (দাসদের প্রশিক্ষণ)
৩। সেবার প্রশিক্ষণ (গরিব, অসহায়দের সাহায্য-সহযোগিতা করা)
৪। অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ (রিসালাতুল হুকুক)

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মানুষকে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, চিন্তা এবং আর্থিক দিক থেকে এমন একটি পর্যায়ে উন্নিত করতে চেয়েছেন যাতে মানুষ সামজিকভাবে তাদের সকল দায়িত্ব কর্তব্যকে সঠিকভাবে বুঝতে ও পালন করতে পারে। কেননা তারাই কেবল সঠিকভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে যারা সার্বিকভাবে নিজেকে গঠন ও আত্মশুদ্ধি করতে পেরেছে। আর এধরণের মানুষরাই সমাজের সংস্কার, বাস্তব উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করতে পারে।

ইমাম সাজ্জাদের মকতব তথা মতাদর্শে অগণিত মানুষ উন্নত নৈতিক শিক্ষালাভ করেছেন। তার মকতবে এমন সকল ফকীহ, আলেম এবং মনিষীরা গড়ে উঠেছেন যারা পরবর্তীতে সমাজের সব থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পেরেছেন। সব শেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন এই কিতাবকে আমার আমল নামায় যুক্ত করেন এবং সেই দিনে আমাকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করেন যেদিন মানুষের সন্তান, সম্পত্তির কোনটাই তার কাজে আসবে না শুধুমাত্র কালবে সালিম তথা পবিত্র ও সুস্থ অন্তর ছাড়া। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল আশাবাদিদের আশ্রয়কেন্দ্র, আশার মানদণ্ড এবং দান ও রহমতের উৎস।

আল্লাহুল মুসতায়ান
আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ
আল হিল্লা-আল কাতিফ
শুক্রবার, ৭ রমজান, ১৪৩৮ হিজরি, ২ জুন, ২০১৭ ইং

অনুবাদকের কথা

জাহেলি আরবে মহানবীর আবির্ভাব ছিল মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অতি বড় নেয়ামত। আর এ জন্য আল্লাহ বলছেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনাবলী পাঠ করেন, তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেন এবং গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। নিশ্চয়ই এর আগে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। (আলে ইমরান-১৬৪)

মানুষের পথ-নির্দেশনার জন্য নবী রাসূলদের মনোনয়ন মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ খোদায়ী উপহার। তাই সবারই এ নেয়ামতের গুরুত্ব বোঝা উচিত।

জ্ঞানের চেয়ে আত্মসংশোধন বা পবিত্রতা বেশি জরুরী। পবিত্র উৎসের জ্ঞানই কল্যাণকর বা উপকারী।

বিশ্ব ইতিহাস নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রসহ মানবীয় মূল্যবোধের সবক্ষেত্রেই যাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী তাঁদের মধ্যে হযরত আলী বিন হুসাইন (আ.) তথা ইমাম সাজ্জাদের অবস্থান অত্যন্ত প্রজ্জল ও শীর্ষস্থানীয়।

সত্যিকারের ও উন্নত মানুষ গড়ার এই মহান সাধক ইমাম যাইনুল আবেদিন বা খোদা প্রেমিকদের অলঙ্কার হিসেবেও খ্যাত। মহান আল্লাহর দরবারে অত্যধিক সিজদায় মগ্ন থাকতেন বলে ইমাম জয়নুল আবেদিন (আ.)-কে বলা হত সাজ্জাদ।

নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা যেন তাঁর অনুপম চরিত্র এবং উচ্চতর খোদায়ী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যাদুময় ছোঁয়ায় পেয়েছে চিরন্তন সৌন্দর্য ও অনির্বাণ প্রাণ।

কারবালার বিশ্বনন্দিত মহাবিপ্লবের ঘটনায় ইমাম হুসাইন (আ.)'র একমাত্র যে পুত্র বেঁচেছিলেন তিনি হলেন ইমাম সাজ্জাদ (আ.)। অর্থাত তিনিই ছিলেন বিশ্বনবী (স.)'র পবিত্র বংশধারার বা আহলে বাইতের একমাত্র পুরুষ সদস্য যিনি কারবালার ঘটনায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। অসুস্থ ছিলেন বলে তিনি ওই জিহাদে সরাসরি যোগ দিতে পারেননি। আসলে মহান আল্লাহ অলৌকিকভাবেই তাঁকে রক্ষা করেছিলেন মুসলিম জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এবং ইসলামের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিত্তি রচনার জন্য।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তাঁর কাজ ও আচরণ ছাড়াও বেশকিছু অনুপম দোয়ার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন গভীর খোদা-প্রেম, নৈতিকতা ও উন্নত আত্মার সৌন্দর্য।

মানুষের মধ্যে অনেকেই এই অস্থিরতায় ভোগেন যে, এই যে এত দোয়া করছি তা কেন কবুল হয় না? ইমামের কাছে ঠিক এমনই এক প্রশ্ন করেছিলেন বার বার প্রার্থনার পরও

দোয়া কবুল না হওয়ার ফলে হতাশ হয়ে পড়া এক ব্যক্তি এবং ওই ব্যক্তির বন্ধু। জবাবে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বলেছিলেন, "তোমরা কি সময় মত নামাজ আদায় কর, না দেরি করে নামাজ পড়? তোমরা কি সৎ কাজের মাধ্যমে ও দরিদ্রদের দান-সদকা দেয়ার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করছ? তোমরা কি বন্ধুদের সঙ্গে (ভেতরে-বাইরে) একই রূপ বজায় রাখ ও তাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ কর না? তোমরা কি কথা বলার সময় অশালীন ভাষা ব্যবহার কর না? তোমরা কি যাকাত দাও ও ঋণ পরিশোধ কর? তোমরা কি কঠোর হৃদয় নিয়ে ফকিরদেরকে বিমুখ করে দাও না? তোমরা কি ইয়াতিমদের সাহায্যে এগিয়ে যাও?"

এভাবে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) যখন একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন তখন নিরাশ হয়ে পড়া ওই ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বললেন, হে ইমাম, এসব ভালকাজের কিছুই আমি করি না। তখন ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মুচকি হেসে বললেন, "তাহলে আল্লাহর কাছে কি আশা করছ? তোমাদের এই অবস্থা পরকালে তোমাদের জন্য সংকটের কারণ হওয়ার পাশাপাশি এই দুনিয়াতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যে কারণে তোমাদের দোয়াগুলো কবুল হয় না। তোমরা যদি আল্লাহর কথা শোন, তাহলে আল্লাহও তোমাদের কথা শুনবেন।"

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ইসলামের ইতিহাসের চরম দুর্যোগপূর্ণ সময়ে এ মহান ধর্মের সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত বিপ্লবের ভিত্তি গড়ার জন্য তুলে ধরেছিলেন খাঁটি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের নানা দিক। তাঁর প্রচারিত সেসব শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সংকলন হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে "সহিফা-ই সাজ্জাদিয়া"। অনেকেই একে "আলে মুহাম্মাদের জাবুর" বলে থাকেন। দোয়া ও আল্লাহর প্রতি মনের গভীর আকুতি এবং আবেদন-নিবেদনের আঙ্গিকে তুলে ধরা এসব বক্তব্যে রয়েছে সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আর সেগুলো সব যুগের মানুষ ও মুসলমানের জন্যই মহাকল্যাণের উৎস ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের দিক-নির্দেশক।

এ ধরণের শিক্ষামূলক দোয়া হৃদয়ঙ্গম করা আত্মগঠন, নফসের বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উচ্চতর লক্ষ্যগুলো উপলব্ধিসহ খোদা প্রেমের অনুভূতি ও যুক্তি আয়ত্তের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। এসব দোয়ার আলোকিত প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন মু'মিন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই সেসবের গভীর তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করবেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তাঁর বিভিন্ন দোয়ায় মানুষকে এটা শেখাতে চেয়েছেন যে, জীবনের সব পর্যায়েই আল্লাহর ওপর নির্ভরতা জরুরী। আল্লাহই যেন মানুষের সব তৎপরতার মূল অক্ষে বা কেন্দ্রে থাকেন। আল্লাহর প্রতি হৃদয়ে গভীর প্রেম বা ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। অবশ্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁকে চেনাও জরুরি। আল্লাহকে চেনা ও জানার মধ্য দিয়েই খোদাপ্রেমিকের যাত্রা শুরু হয়।

"সহিফা-ই সাজ্জাদিয়া"র প্রথম দোয়ায় আল্লাহর অনবদ্য ও অনুপম প্রশংসা করতে গিয়ে ইমাম বলেছেন, "তুমি সেই আল্লাহ দর্শকদের দৃষ্টি যাকে দেখতে পায় না,

বর্ণনাকারীদের চিন্তা বা কল্পনাশক্তি তোমার বর্ণনা দিতে অক্ষম। তুমি নিজ ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছ সৃষ্টি জগত ও সৃষ্টিকুল এবং তাদের সৃষ্টি করেছ নিজ ইচ্ছায়। অথচ এর আগে এসব সৃষ্টির কোনো মডেল বা নমুনার অস্তিত্ব ছিল না।"

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক দায়িত্বসহ মানুষের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সহিফায়ে সাজ্জাদিয়ায় স্থান পাওয়া ইমাম সাজ্জাদ (আ.)'র দোয়াগুলো খুবই কার্যকর। বাবা-মা সম্পর্কে তাঁর দোয়ার একাংশে বলা হয়েছে: "হে আল্লাহ! আমার কণ্ঠ যেন বাবা মায়ের সামনে নীচ বা অনুচ্চ থাকে। আমার বক্তব্য যেন তাদের জন্য হয় সন্তোষজনক। আমার আচরণ যেন তাঁদের সামনে বিনম্র থাকে; তাদের জন্য আমার অন্তরকে দয়ার্দ্র কর। আমি যেন তাঁদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেই এবং আমাকে তাঁদের প্রতি কোমল ও স্নেহশীল করুন।"

"রিসালাতুল হুকুক" ইমাম সাজ্জাদ (আ.)'র আরেকটি অনন্য অবদান। এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা। এসবের মধ্যে রয়েছে মানুষের শরীরের নানা অঙ্গের অধিকার, নানা ধরণের ইবাদতের অধিকার; বাবা, মা, শিক্ষক, ছাত্র, বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, ভাই, উপকারকারী, সহচর, প্রতিবেশী, অংশীদার, অর্থ, ঋণপ্রার্থী, শত্রু, খারাপ লোক, ভিক্ষুক, দ্বীনী ভাই, একসাথে বসবাসকারীর অধিকার এবং ইসলামের আশ্রয়ে থাকা কাফেরদের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা। যেমন, পেটের অধিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: পেটকে হারাম খাবারে পূর্ণ করো না এবং উদর ভর্তি করে খেয়ো না।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করার উপায় হল, মানুষকে দেয়া ওয়াদা রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, সব সময় আল্লাহ যে আমাদের দেখছেন তা মনে রাখা ও নোংরা কাজ না করা এবং নিজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করা।"

কোরআনের শিক্ষা ও রাসূল (সা.) এবং তার পবিত্র আহলে বাইতের আদর্শ অনুযায়ী আত্মগঠন ও আত্মসংশোধনের চেষ্টা চালাতে হবে। এ দুই পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে আত্মগঠন ও আত্ম সংশোধনের যতপ্রচেষ্টাই চালানো হোক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মহানবীর (সা.) পর পবিত্র আহলে বাইত আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আত্মশুদ্ধির সকল পথকে নিজেরা পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ইমাম সাজ্জাদের (আ.) সহিফা সাজ্জাদিয়া এবং রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থ তারই একটি বড় নমুনা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর আনীত ঐশ্বরিক পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্নস্থানে মানবাধিকারের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইসলামে সার্বজনীন মানবাধিকারের বিষয়টি জীবনের সর্বক্ষেত্র ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবময় অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। মানুষকে সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মর্মবাণী শুনিয়ে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, বংশীয় মর্যাদা, শ্রেণীবৈষম্য ও বর্ণপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। অধীনদের প্রতি সদাচারী ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দিয়েছে। আরব-অনারব, সাদা-কালো

সবাই একই পিতা-মাতা হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। মানুষের মধ্যে মর্যাদার কোনো পার্থক্য হতে পারে না। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানবজাতির সম্মান ও মর্যাদার অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার, জীবনরক্ষণ ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও বাকস্বাধীনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, একতা, সংঘবদ্ধ ও সাম্যের অধিকার, হালাল উপার্জনের অধিকার, এতিম, মিসকিন, অসহায় নারী ও শিশুর অধিকার, প্রতিবেশির অধিকার, কৃষক-শ্রমিকের অধিকার, প্রতিবন্ধিদের অধিকার প্রভৃতি সব ব্যাপারেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ হিসেবে ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the UN General Assembly- সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার পায়, অথচ ১৫০০ বছর আগে আল কোরআনের সূরা নিসা বিশেষ করে নারীদের জন্য অবতীর্ণ হয়, যাতে নারীদের সম্পত্তি ভোগের অধিকার ও অংশ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামিক বিধান: সূরা আম্বিয়া - ১০৭:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাসুল (সা.)-কে বলেন, 'আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।'

রাসুল (সা.)-কে আল্লাহ কেবল মুসলিমদের জন্য আশির্বাদ তথা রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেন নি, অমুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানসহ সমগ্র মানবজাতির জন্য, জ্বীন জাতি, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত সকল সৃষ্ট বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। হাদিসে বলা হয়েছে, যে মানুষের কল্যাণ করে, সেবা করে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি। এখানে মুসলিম বা মোত্তাকি বলা হয়নি, মানুষ বলা হয়েছে, মুসলিম, অমুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সব মানুষের সেবার কথা বলা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, এতিম, বিধবা, চাকর-চাকরানী, মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের অধিকার ইসলামে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া আছে। এই সকলের নির্ধারিত অধিকার প্রদান করাকে ইসলাম অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম বলে, মানুষের অধিকার হরণ বা নষ্ট করা হলে নিজের নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়। যতক্ষণ সে ক্ষমা না করে দেবে, ততক্ষণ অপরের অধিকার নষ্ট করার অপরাধের ক্ষমা পাওয়া যাবে না।

লেখক উপরোক্ত সকল বিষয়কে দৃষ্টিতে রেখে ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর দৃষ্টিকোন থেকে অত্র পুস্তকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে মানুষের নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যা প্রতিটি সচেতন মানুষের আত্মার খোরাক হিসাবে কাজ করবে, ইনশা আল্লাহ।

বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ করা হয় নি বরং বিষয়বস্তুকে সুন্দর ও নিপুণভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বরাবরে সকল প্রচেষ্টাই অত্যান্ত নগন্য। তাই নিজের সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতাকে স্বীকার করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং লেখককে তার এই মূল্যবান লেখনির জন্য উত্তম পুরস্কার দান করেন। আর এই অধমও যেন অনুবাদ করার সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হই।

বিনীত

মোহাম্মাদ আলী মোর্ত্তজা-বাংলাদেশ

১০ জামাদিউস সানি, ১৪৪২ হিজরি, ২৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

উৎসর্গ

আমি অধম এই প্রচেষ্টাকে সকল নবী রাসূলগণ, ইমামগণ এবং বিশেষ করে হযরত হুজ্জাত ইবনিল হাসান সাহেবুল আসরে ওয়ায যামান, ইমাম মাহদী (আ.)-এর খেদমতে উৎসর্গ করছি। আর প্রর্থনা এটাই যেন এ প্রচেষ্টা আপনার দরবারে কবুল হয়।

ইমাম সাজ্জাদ এবং দোয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

ভুমিকা

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তার বান্দাদেরকে বারংবার দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছে। এসম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ

তোমার পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।[১]

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আল্লাহ আরও বলেনঃ

আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে, তখন বলে দিন আমি তো কাছেই রয়েছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক,যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। আর পূর্ণতা লাভ করে।[২]

মহান আল্লাহ এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সাথে যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন। সুতরাং একজন মু'মিনের জন্য কর্তব্য হল সে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।

দোয়ার ফজিলত ও গুরুত্বের অধ্যায়ে বহু মুতাওয়াতির হাদিস রয়েছে যার মাধ্যমে দোয়ার মর্যাদা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চাহিদা পূরণ হওয়ার ক্ষেত্রে দোয়ার ভুমিকা স্পষ্ট হয়ে যায়।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেনঃ দোয়া হচ্ছে ইবাদতের রুহ তথা আত্মাস্বরূপ।[৩]

তিনি আরও বলেছেন: দোয়া হচ্ছে মু'মিনের অস্ত্র, দ্বীনের স্তম্ভ এবং জমিন ও আসমানের নুর।[৪]

১। সূরা মু'মিন-৬০

২। সূরা বাকারা -১৮৬

৩। মুস্তাদরাকুল ওসায়েল, তাবারসি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১৬৮, হাদিস- ৫৫৭৬।

৪। উসুলে কাফি,শেইখ কুলাইন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৯ ।

এ ছাড়াও মহানবী আরও বলেছেন যে, আল্লাহর নিকট দোয়ার থেকে মূল্যবান আর কোন জিনিস নেই।[১]

রাসূল (সা.) আরও বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমলের দিক থেকে সমমানের দুই ব্যক্তিকে বেহশতে প্রবেশ করানো হবে। এরপর একজনকে অন্যজন থেকে বেশী মর্যাদা দেয়া হবে। তখন ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করবে, হে আল্লাহ! আমলের দিক থেকে তো আমরা সমান ছিলাম তাহলে পুরস্কারের ক্ষেত্রে কেন আলাদা করা হল? তখন তাকে জবাব দেয়া হবেঃ সে আমার কাছে দোয়া করত কিন্তু তুমি আমার কাছে দোয়া করতে না।

তিনি আরও বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে যত পার চেয়ে নাও। কেননা তার নিকট কোন কিছুই বড় বা অসাধ্য নয়। [২]

এসম্পর্কে আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (আ.) বলেছেনঃ পৃথিবীতে আল্লাহর নিকট সব থেকে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে দোয়া। [৩]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেনঃ সর্বদা দোয়া কর। কেননা দোয়ার মধ্যে সব ধরনের রোগের শিফা তথা আরোগ্য রয়েছে। [৪]

মাবিয়া বিন আম্মান বলেন, আমি ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর কাছে গিয়ে বললাম: হে ইমাম আমার জান আপনার জন্য কোরবান হোক। আমি জানতে চাই দু'ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তাদের মধ্যে একজন নামাজে দাঁড়ালো আরেকজন দোয়াতে মশগুল হল। এখন এদের মধ্যে কে বেশী উত্তম। ইমাম জবাব দিলেনঃ দু'জনই উত্তম। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: হে ইমাম! তাদের মধ্যে কে বেশী উত্তম? ইমাম জাবাব দিলেনঃ যে বেশী দোয়া করবে সে বেশী উত্তম। কেননা এটা তোমার জানা উচিত যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: তোমরা আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের চাওয়া পূরণ করব।[৫]

এ ধরনের সকল হাদিস থেকে দোয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এটা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে দোয়া সকল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর একারণেই আমাদের উচিৎ ইমামদের থেকে বর্ণিত দোয়াসমূহ সঠিকভাবে পড়া এবং তার অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য আমাদেরকে এ দোয়া পাঠ করতে হবে এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সাথে পরিচিত হতে বেশী করে অধ্যয়ন করতে হবে।

৫। বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসি, ৯০তম খণ্ড, পৃ: ২৯৪, হাদিস- ২৩।

৬। বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসি, ৯০তম খণ্ড, পৃ: ২৯৪, হাদিস- ২৩; ওসায়েলুশ শিয়া, হুররে আমেলি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪, হাদিস- ৮৬০৫।

৭। ওসায়েলুশ শিয়া, হুররে আমেলি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩১, হাদিস- ৮৬২৮।

৮। উসূলে কাফি,শেইখ কুলাইন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭০।

৯। সূরা মু'মিন-৬০; মাজমাউল বায়ান ফি তাফসিরেল কুরআন, আল্লামা তাবারসি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৮২৩

সাহিফা সাজ্জাদিয়া এবং দোয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মুসলমানদের হেদায়াতের জন্য অনেক বড় ও অতি মূল্যবান দোয়ার ভাণ্ডার রেখে গেছেন। এ মহান ইমামের দোয়ার মধ্যে অতি মূল্যবান ও গভীর আকিদাগত, নৈতিক ও চিন্তাগত খোরাক রয়েছে।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) দোয়াকে প্রশিক্ষণের উত্তম হাতিয়ার বানিয়েছেন। তিনি দোয়ার মাধ্যমে বড় বড় আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির তৈরি করেছেন, যারা নৈতিকতা ও ফজিলতের ময়দানে অনেক বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ইমামের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এমন সব ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছেন যারা জ্ঞান, গরিমা এবং ইলম ও মারেফাতের সর্বোচ্চ চুড়ায় অবস্থান করেন। এছাড়াও তারা সকল বিদ্যায় সবার থেকে অগ্রগামী ছিলেন।

সহিফা সাজ্জাদিয়া যা ইমামের সকল দোয়ার সমাহার তা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে মোনাজাত এবং ক্রন্দনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার মধ্যে রয়েছে উন্নতমানের আকিদাগত, চিন্তাগত, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক খোরাক, যাকে এক কথায় সকল প্রকার জ্ঞান-গরিমার ভান্ডার বলা যায়।

সহিফা সাজ্জাদিয়ার গুরুত্বের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এই মূল্যবান গ্রন্থের উপর বহু ব্যাখ্যা ও তাফসির লেখা হয়েছে। শেইখ আগা বোযোরগ তেহরানী তার বিখ্যাত আয যারিয়া ফি তাসানিফেশ শিয়া গ্রন্থে সহিফা সাজ্জাদিয়ার ব্যাখ্যা লিখেছেন।

সহিফা সাজ্জিাদিয়া প্রশিক্ষণের গ্রন্থ হওয়ার পাশাপাশি একটি বড় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ যা মানুষকে আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য নুরানি ও আলোকিত একটি মাধ্যম।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) দোয়ার মাধ্যমে সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আর এ জন্য তিনি প্রথমে এমন ছাত্র তৈরি করেছেন যারা ইমামকে সমাজ থেকে অন্যায় দূর করার কাজে এবং সমাজ সংস্কারের কাজে সাহায্য করতে পারে।

সহিফা সাজ্জাদিয়ার গুরুত্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে এ মূল্যবান গ্রন্থকে আলে মুহাম্মাদের যাবুর বলা হয়েছে। সাহিত্য মান এবং বাক্যালঙ্কারের দিক থেকেও এটাকে নাহজুল বালাগর পরেই স্থান দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় মহান মারজায়ে তাকলিদ আয়াতুল্লাহ মারআশি নাজাফিও আহলে সুন্নতের স্বনামধন্য মুফতী এবং মুফাসসির তানতাবিকে যখন সহিফায়ে সাজ্জাদিয়া বইটি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলেছিলেনঃ

এটা আমাদের বদ নসিব বা দুর্ভাগ্য যে আমরা আজও রাসূলের (সা.) সিলসিলা তথা আহলে বাইত থেকে বঞ্চিত রয়েছি। আমি যতবারই বইটি পড়েছি ততবারই মনে হয়েছে যে, এটা আল্লাহর কালামের (বাণীর) নিচে এবং মানুষের কালামের (বানীর) অনেক উর্দ্ধে।

সহিফা সাজ্জাদিয়ায় ৬০টিরও বেশী দোয়া রয়েছে যার শিরোনামসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১। আল্লাহর পশংসা (হামদে এলাহি)
২। মহানবীর উপর দুরুদ ও সলাম
৩। আরশের বহনকারীদের উপর দুরুদ ও সলাম
৪। নবীদের উপর ঈমান আনয়নকারীদের উপর দুরুদ ও সলাম
৫। নিজের এবং নিজের বন্ধুদের জন্য দোয়া
৬। সকাল ও সন্ধার দোয়া
৭। কঠিন সমস্যার সময়ে দোয়া
৮। আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া
৯। মাগফিরাতের (ক্ষমা প্রার্থনার) জন্য দোয়া
১০। আল্লাহর আশ্রয় পাওয়ার জন্য দোয়া
১১। শেষ পরিণতি ভাল হওয়ার জন্য দোয়া
১২। গোনাহ স্বীকার এবং তওবার জন্য দোয়া
১৩। আশা পুরণ হওয়ার জন্য দোয়া
১৪। অত্যাচারির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া
১৫। রোগ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া
১৬। ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য দোয়া
১৭। শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া
১৮। বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া
১৯। বৃষ্টির জন্য দোয়া
২০। পাক পবিত্র এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য দোয়া
২১। দুঃখ কষ্টের সময়ে দোয়া
২২। কঠিন পরিস্থিতিতে দোয়া
২৩। সুস্থতা ও শান্তির জন্য দোয়া
২৪। পিতা-মাতার জন্য দোয়া
২৫। সন্তানের জন্য দোয়া
২৬। প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের জন্য দোয়া
২৭। সীমান্ত রক্ষীদের জন্য দোয়া
২৮। আল্লাহর সাথে মোনাজাত করার দোয়া
২৯। অভাব থেকে মুক্তির দোয়া
৩০। ঋন পরিশোধের জন্য দোয়া
৩১। তওবার জন্য দোয়া
৩২। তাহাজ্জুদের নামাজের পরে দোয়া
৩৩। ইস্তিখারার দোয়া

৩৪। গোনাহের অপমান থেকে বাচার দোয়া
৩৫। আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার দোয়া
৩৬। বিদ্যুৎ চমকানো বা বজ্রপাতের সময় দোয়া
৩৭। শুকরিয়া আদায়ে অবহেলার জন্য দোয়া
৩৮। মাগফিরাতের জন্য দোয়া
৩৯। ক্ষমা ও রহমতপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য দোয়া
৪০। মৃত্যুকে স্মরণ করার সময় দোয়া
৪১। অন্যের দোষত্রুটি গোপন রাখার দোয়া
৪২। কোরআন খতম করার দোয়া
৪৩। নতুন চাঁদ দেখার দোয়া
৪৪। রমজান মাসকে স্বাগত জানানোর দোয়া
৪৫। রমজান মাসকে বিদায় জানানোর দোয়া
৪৬। দুই ঈদ এবং জুমার দিনের দোয়া
৪৭। শত্রুর চক্রান্ত ও ধোকা থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া
৪৮। আরাফা দিবসের দোয়া
৪৯। কুরবানি ঈদ এবং শুক্রবারের দোয়া
৫০। আল্লাহর ভয়ে দোয়া
৫১। অসহায় অবস্থা এবং অক্ষমতায় দোয়া
৫২। কান্নাকাটি ও কষ্টের সময়ে দোয়া
৫৩। অক্ষমতা ও নমনীয়তার সময়ে দোয়া
৫৪। দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি বা দূরে থাকার জন্য দোয়া
৫৫। তাসবিহর দোয়া
৫৬। হামদ বা প্রশংসার জন্য দোয়া
৫৭। আলে মুহাম্মাদকে স্মরণ করার সময় দোয়া
৫৮। হযরত আদম (আ.)-এর উপর দরুদ
৫৯। কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য দোয়া
৬০। ভয়-ভীতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দোয়া
৬১। অপারগতার দোয়া
৬২। রবিবারের দোয়া
৬৩। সোমবারের দোয়া
৬৪। মঙ্গলবারের দোয়া
৬৫। বুধবারের দোয়া
৬৬। বৃহস্পতিবারের দোয়া
৬৭। শুক্রবারের দোয়া
৬৮। শনিবারের দোয়া
৬৯। মোনাজাতে খামসা আশার

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) যে সকল দোয়াসমূহকে দিবা-রাত্র পড়তেন, তা মূলত মানুষের নৈতিকতা, প্রশিক্ষণ, আকিদা এবং সংস্কৃতির ভিত্তি। তিনি দোয়াকে সামাজিক চিন্তা, কাজ, নৈতিকতা ও প্রশিক্ষণের একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন।

মোটকথা হল, নিজেদেরকে শুধুমাত্র দোয়া পাঠ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বরং তার অর্থ ও শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে।

দোয়া প্রতিটি মুসলমানের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আত্মশুদ্ধির সর্বোত্তম হাতিয়ার। সুতরাং মানুষের জীবনে দোয়ার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে নিম্নরূপে সাজানো হয়েছেঃ

১। দোয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শিরোনামে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। দোয়ার প্রভাব এবং গুরুত্ব।

৩। দোয়া কবুল হওয়ার শর্তাবলী।

৪। দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ।

৫। কিছু কবুল দোয়ার নমুনা।

দোয়ার প্রভাব

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে মানুষকে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমার পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।[১]

মহান আল্লাহ মানুষকে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন তিনি তা কবুল করবেন। সুতরাং সবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হল তার ধর্মীয় এবং দুনিয়ার সকল চাহিদার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

দোয়ার বহু ফজিলত, গুরুত্ব এবং প্রভাব রয়েছে যার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১। দোয়া আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম। বান্দা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তার গোনাহ মাফের জন্য তওবা করে এবং ক্ষমা চায়। আর দোয়া হচ্ছে আল্লাহর রহমতের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। কেননা আল্লাহ তার বান্দার প্রতি অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

তারা কি অবহিত নয় যে, আল্লাহ তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন, আর তিনিই সদকা গ্রহণ করেন এবং তিনি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।[২]

২। দোয়া মানুষের আধ্যাত্মিকতা ও আন্তরিকতাকে বৃদ্ধি করে দেয়। দোয়া মানুষকে আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালিত করে। বিশেষকরে ইমামদের থেকে বর্ণিত দোয়ার মধ্যে অনেক মর্মার্থ লুকায়িত থাকে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মানুষ পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে। যেমন: দোয়া কুমাইল, দোয়া নুদবা ইত্যাদি।

৩। দোয়ার মাধ্যমে মানুষ তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকলকিছু চাইতে পারে। যেভাবে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেনঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে, তখন বলে দিন আমি তো কাছেই রয়েছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া

১০। সূরা মু'মিন-৬০
১১। সূরা তাওবা-১০৪

দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে। আর পূর্ণতা লাভ করে।[১]

মহান আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, যারা নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবে আল্লাহ তা কবুল করবেন। সুতরাং মু'মিনের দায়িত্ব হল আল্লাহর কাছে নিজের দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল কিছু প্রার্থনা করা।

৪। দোয়ার মাধ্যমে মানুষের অন্তর নুরানি হয় এবং ভাষা ও অন্তর পবিত্র হয়ে যায়। তার চিন্তা চেতনা সুস্থ ও সুন্দর হয়। আর এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলার আদব-কায়দা এবং ভদ্রতা শিখতে পারে।

৫। ইমামদের থেকে বর্ণিত দোয়া এতটাই গভীর ও আধ্যাত্মিক হয়ে থাকে যা নিয়মিত পাঠ করতে পারলে সেই আধ্যাত্মিকতা মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

৬। দোয়া হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা অর্জনের মাধ্যম। এর মাধ্যমে মানুষ নফসের সকল খারাপ চাহিদা থেকে মুক্ত থাকে। অনুরূপভাবে তা মানুষকে ভাল নৈতিকতা ও আদব-কায়দা শিখতে সাহায্য করে।

১২। সূরা বাকারা -১৮৬

দোয়া কবুল হওয়ার শর্তাবলী

দোয়া কবুল হওয়া এবং তার প্রভাব প্রকাশিত হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যা না থাকলে দোয়া কবুল হবে না। নিম্নে দোয়া কবুল হওয়ার কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করা হলঃ

১। আল্লাহর মা'রেফাত অর্জন করা

দোয়া করার পূর্বে আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনা এবং জানা একান্ত জরুরী। কেননা মারেফাত ছাড়া দোয়ার কোন অর্থ হয় না। ইমাম কাজেম (আ.) বলেন, ইমাম জাফর সাদিকের কাছে কিছু ব্যক্তি এসে বলল: আমরা দোয়া করি কিন্তু আমাদের দোয়া কবুল হয় না। ইমাম বললেন: কেননা তোমরা যার কাছে দোয়া চাও তাকে সঠিকভাবে চেননা। সুতরাং যারা আল্লাহর মারেফাত রাখে আর যারা আল্লাহর মা'রেফাত রাখে না তাদের দোয়ার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

২। আল্লাহর বিধি-বিধান মান্য করা

দোয়া কবুল হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা এবং হারাম থেকে দূরে থাকা। ওয়াজিব পালন করা এবং হারাম পরিত্যাগ করা হচ্ছে দোয়া কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বদা গোনাহ করে এবং আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে গোনাহ করে তাদের দোয়া কবুল হয় না। ইমাম আলী (আ.) বলেন: ভাল কাজ করা ছাড়া দোয়া করার অর্থ হল ধনুক ছাড়াই তীর ছোড়া।[১]

৩। আন্তরিকভাবে চাওয়া

দোয়া করার সময় মানুষকে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, নইলে দোয়া কবুল হবে না। আর এ জন্যই গাফেল ও উদাস লোকের দোয়া কবুল হয় না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন: গাফিল ও উদাসলোকের দোয়া আল্লাহ কবুল করে না।[২] তিনি আরও বলেছেন: দোয়া করার সময় মনের যে আবেগ সেটাকে গণিমত মনে কর, কেননা সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত।[৩]

আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (আ.) বলেছেন: খেলা-ধুলায় মগ্ন অন্তরের দোয়া কবুল হয় না। অর্থাৎ, যারা হেয়ালি করে দোয়া করে তাদের দোয়া কবুল হয় না।[৪]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন: মহান আল্লাহ গাফেলদের দোয়া কবুল করেন না। আর যখনই আন্তরিকতার সাথে দোয়া করবে মনে রাখবে আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করবেন।[১]

১৩। নাহজুল বালাগ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৪০।, হাদিস-৩৩৮; খিসালে সাদুক, পৃ: ৬২১।
১৪। ওসায়েলুশ শিয়া, হুররে আমুলি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৩; হাদস-৮৭০১;
১৫। বিহারুল আনওয়ার ৯০তম খণ্ড, পৃ: ৩১৩;
১৬। বিহারুল আনওয়ার ৯০তম খণ্ড, পৃ: ৩১৪, হাদিস-১৯

সুতরাং আমরা যদি চাই আল্লাহর দরবারে আমাদের দোয়া কবুল হোক তাহলে অবশ্যই আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে হবে।

৪। হালাল রুজি উপার্জন ও ভক্ষণ করা

হালাল রুজির সন্ধান এবং পরিবারের জন্য হালাল উপার্জন হচ্ছে সব থেকে বড় ইবাদতের মধ্যে অন্যতম। হালাল রুজি মানুষের অন্তর ও চিন্তার উপর ভাল প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের রুজি হালাল হলে তার দোয়াও কবুল হয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি চায় যে তার দোয়া কবুল হোক সে যেন অবশ্যই হালাল রুজি উপার্জন ও ভক্ষণ করে।[২]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যারা চায় যে তাদের দোয়া কবুল হোক তারা যেন হালাল উপার্জন করে এবং অন্যের হক বা অধিকার নষ্ট না করে। কেননা আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না যার উপার্জন হারাম এবং যে অন্যের হক নষ্ট করে।[৩]

৫। ইখলাস এবং নিষ্ঠার সাথে দোয়া করা

মানুষের দোয়া কবুল হওয়ার আরেকটি শর্ত হচ্ছে খালেসভাবে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন:

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত (একনিষ্ঠ) হয়ে তাকেই ডাক। সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহরই।[৪]

অনুনয় বিনয় করে দোয়া করা। এসম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

اُدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে অনুনয় বিনয় করে (কান্নাজড়িত কণ্ঠে) চুপিসারে দোয়া কর। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৫]

ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

১৭। উসূলে কাফি ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৪; হাদিস-১;
১৮। বিহারুল আনওয়ার ৯০তম খণ্ড, পৃ: ৩৬২,
১৯। বিহারুল আনওয়ার ৯০তম খণ্ড, পৃ: ৩৬১, হাদিস-৩১
২০। সূরা গাফির(মু'মিন) -৬৫
২১। সূরা আরাফ -৫৫

আল্লাহকে ডাক ভীতি ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

৬। সঠিক এবং উপযুক্ত সময়ে দোয়া করা

মানুষ সর্বদা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। কিন্তু এমন কিছু সময় রয়েছে যখন দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশী থাকে। যেমন: শুক্রবারে, আরাফার দিন, শবে কদরের রাতে, বৃষ্টির সময়, নামাজের পর, ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত ইত্যাদি সময়ে দোয়া কবুল হয়।

আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (আ.) বলেছেন: তোমরা চারটি সময়ে দোয়া করতে ভুলনা। ১। কোরআন তিলাওয়াতের সময়, ২। বৃষ্টির সময়, ৩। আজানের সময়, ৪। আর যখন কাফের এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।[১]

সাকুনি ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন: পাঁচটি সময়ে অবশ্যই দোয় করবে, যথা: ১। কোরআন তিলাওয়াতের সময়, ২। বৃষ্টির সময়, ৩। আজানের সময়, ৪। আর যখন কাফের এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ৫। যখন কোন মজলুম আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে। কেননা তখন তার মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে কোন ব্যবধান (দূরত্ব) থাকে না।[২]

২২। উসূলে কাফি ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৭; হাদিস-৩;
২৩। আমালি, শেইখ সাদুক, পৃ: ৩২৭; হাদিস-৩৯৩; ওসায়েলুশ শিয়া ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৫;

দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ

দোয়া কবুল না হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে যা দোয়া কবুল হতে বাধা দেয়। নিম্নে কিছু কারণ উল্লেখ করা হল:

১। গোনাহ

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যা নিষেধ করেছেন তা অমান্য করলে এবং গোনাহের পর গোনাহ করতে থাকলে এবং তওবা না করলে দোয়া কবুল হয় না। যেমন দোয়া কুমাইলে আমরা আল্লাহর কাছে বলি: হে আল্লাহ! আমার ওই সকল গোনাহ মাফ করে দাও যা আমার দোয়া কবুল হতে বাধা সৃষ্টি করে।

হযরত আলী (আ.) বলেছেন: তোমরা তোমাদের দোয়া কবুল না হওয়ার জন্য হয়রান হয়ো না। কেননা তোমরা নিজেরাই গোনাহের মাধ্যমে দোয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছ।[১]

২। অন্যের উপর জুলুম এবং অত্যাচার করা

মানুষের উপর জুলুম করলে, আত্মিয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, পরিবারের লোকজন, পিতামাতা এবং সন্তানের উপর জুলুম করলে দোয়া কবুল হয় না।

হযরত আলী (আ.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কারও উপর জুলুম দেখে চুপ থাকে তার উপরও অন্যরা জুলুম করে। তার দোয়া কবুল হয় না এবং তার উপর যে জুলুম হয়েছে তার জন্যও সে পুরস্কার পাবে না। [২]

৩। ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ না করা

অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে এবং ন্যায়ের আদেশ না দিলে দোয়া কবুল হয় না। নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য দোয়া করার পাশাপাশি সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্যও দোয়া করতে হবে। সামাজিক কোন সমস্যা দেখা দিলে তার থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করতে হবে। সমাজে যদি ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তাদের দোয়া কবুল হবে না।

রাসূল(সা.) বলেছেন: তোমরা যদি ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করা ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের উপর অত্যাচারীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এমনকি তখন যদি তোমাদের ভাল লোকরাও দোয়া করে তাদের দোয়াও কবুল হবে না।[৩]

৪। হারাম খাওয়া

২৪। উয়ুনুল হেকাম ওয়াল মাওয়ায়েজ, পৃ: ৫২৪। মিযানুল হিকমা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৮৪।
২৫। ওসায়েলুশ শিয়া ১৬ম খণ্ড, পৃ: ৫৬; হাদিস- ২০৯৬৬
২৬। বিহারুল আনওয়ার ৯০তম খণ্ড, পৃ: ৩৬৮, হাদিস-২

মানুষের উপার্জন যদি হারাম এবং অবৈধ হয়, যেমন: সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, অন্যায়ভাবে কারও সম্পত্তি ইত্যাদি দখল করলে তাদের দোয়া কবুল হবে না।

হাদিসে বর্ণিত আছে, একদা হযরত মুসা (আ.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে। আল্লাহ হযরত মুসাকে বললেন: সে যতই কান্নকাটি করুক না কেন তার দোয়া কবুল হবে না। কেননা তার সমস্ত উপার্জন হারাম এবং সে হারাম খাদ্য দিয়ে তার উদর, বাড়ি ইত্যাদি ভর্তি করে রেখেছে।[১]

সুতরাং হারাম খাদ্য, হারাম উপার্জন এবং হারাম সম্পদ দিয়ে বাড়িঘর নির্মাণ করাও হারাম। হারাম উপার্জন এবং খাদ্য মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে দেয় এবং দোয়া কবুল হওয়া থেকেও সে বঞ্চিত হয়।

৫। আল্লাহর ইচ্ছা

অনেক সময় আল্লাহর ইচ্ছার কারণে দোয়া কবুল হয় না। কেননা আল্লাহই ভাল জানেন কখন কোন জিনিসটা আমাদের জন্য ভাল আর কখন কোন জিনিসটা আমাদের জন্য খারাপ। তাই আমরা ভাল মনে করে কিছু চাইলেও আল্লাহ যেহেতু জানেন সেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর তাই তিনি সেটা তখন আমাদের দেন না বরং যথাসময়ে তিনি সেটা আমাদের দিয়ে থাকেন। সুতরাং অনেক সময় মহান আল্লাহ আমাদের ভাল এবং কল্যাণের জন্যই আমাদের দোয়াকে কবুল করেন না।

ইসহাক বিন আম্মার বলেন: আমি ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর কাছে প্রশ্ন করলাম: মু'মিনের দোয়া তো কবুল হয়। কিন্তু তার দোয়া কবুল হতে কি দেরি হতে পারে?

ইমাম জবাবে বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই। এমনকি কারও দোয়া কবুল হতে ২০ বছরের বেশীও সময় লেগে যেতে পারে। [২]

২৭। মিনহাজুদ দাওয়াত, পৃ: ২৪, হাদিস-৩৪; । বিহারুল আনওয়ার ৯০তম খণ্ড, পৃ: ৩৬২, হাদিস-১৪;
২৮। বিহারুল আনওয়ার ৯০তম খণ্ড, পৃ: ৩৬৫, হাদিস-১৬;

যে সকল দোয়া অবশ্যই কবুল হয়

১। নেক সন্তানের জন্য বাবার নেক দোয়া এবং খারাপ সন্তানের জন্য বাবার বদ দোয়া

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন: তিন ধরনের দোয়া কখনোই বিফল হয় না যথা:

নেক সন্তানের জন্য পিতার নেক দোয়া এবং খারাপ সন্তানের জন্য পিতার বদ দোয়া, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের বদ দোয়া এবং মজলুমের সাহায্যকারীর জন্য মজলুমের নেক দোয়া কখনোই বিফল হয় না। [১]

পিতামাতার সাথে সদাচারের অনেক পদ্ধতি এবং পন্থা রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে উত্তম হচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করা।

২। জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের বদ দোয়া

রাসূল (সা.) বলেছেন: মজলুমের দোয়া কখনোই বৃথা বা বিফলে যায় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ(সা.) বলেছেন: মজলুমের আর্তনাদকে ভয় কর। কেননা মজলুম যখন নিজের হক আদায়ের জন্য আল্লাহর কাছে আর্তনাদ করে দোয়া করে তখন তা কবুল হয়। [২]

তিনি আরও বলেছেন: মজলুমের ফরিয়াদ তথা আর্তনাদকে ভয় কর। কেননা তার আর্তনাদ বিদ্যুতের গতির থেকেও দ্রুত আল্লাহর কাছে পৌছে যায়। [৩]

মাওলা আলীর কাছে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন: আসমান ও জমিনের দুরত্ব কতটা? ইমাম জবাব দিলেন: আসমান ও জমিনের দুরত্ব হচ্ছে মানুষের দৃষ্টি এবং মজলুমের আর্তনাদের সীমা পর্যন্ত। [৪]

৩। মু'মিনের জন্য মু'মিনের দোয়া

কবুল দোয়াসমূহের মধ্যে আরেকটি দোয়া হচ্ছে মু'মিনের জন্য মু'মিনের দোয়া। বিশেষ করে যে ব্যক্তি সামনে না থাকে তার জন্য দোয়া করলে তা কবুল হয়। কেননা এর মধ্যে ইখলাস এবং নিষ্ঠা বেশী থাকে। আর মহান আল্লাহ এমন দোয়া বেশী কবুল করেন।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন: এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্য দোয়া করলে বালা মুসিবত দূর হয় এবং রিজিক বৃদ্ধি পায়।[৫]

২৯। ওসায়েলুশ শিয়া, হুররে আমুলি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৩; হাদস-৮৭০১;
৩০। কানজুল উম্মাল ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৯; হাসি-৭৫৯৭;
৩১। কানজুল উম্মাল ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৯; হাসি-৭৬০১;
৩২। বিহারুল আনওয়ার ৫৫তম খণ্ড, পৃ: ৯৩, হাদিস-১৪;
৩৩। বিহারুল আনওয়ার ৭১তম খণ্ড, পৃ: ২২২, হাদিস-২;

৪। যে অধিক কোরআন তিলাওয়াত করে তার দোয়া

যে ব্যক্তি অধিক কোরআন তিলাওয়াত করে তার দোয়া সর্বদা কবুল হয়। আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (আ.) বলেছেন: চারটি স্থানে অবশ্যই দোয়া করবে তার মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন তিলাওয়াতের সময়। [১]

প্রতিটি মু'মিনের উচিত হচ্ছে আহলে বাইত থেকে বর্ণিত দোয়া পাঠ করা। কেননা তাঁদের থেকে বর্ণিত দোয়ার মধ্যে অনেক উচ্চ পর্যায়ের মা'রেফাত, আকিদাবিশ্বাস এবং নৈতিকতা লুকায়িত থাকে।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং দাসদের প্রশিক্ষণ

যুগ যুগ ধরে মানব সমাজের মধ্যে দাস প্রথা চলে আসছে। ইসলামের পূর্বেও ছিল এবং ইসলাম আসার পরও বহুদিন এটা প্রচলিত ছিল। তবে ইসলাম এই দাস প্রথাকে উৎখাত করার জন্য অনেক গঠণমূলক পদক্ষেপ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

প্রথম পদ্ধতি:

ইসলামে দাস মুক্ত করার জন্য অনেক সওয়াবের কথা উল্লেখ আছে এবং আল্লাহর নৈকিট্য হাসিলের জন্য দাস মুক্ত করা একটি উত্তম পন্থা। ইসলামে অনেক গোনাহের কাফফারাস্বরূপ দাসমুক্তির বিধান রয়েছে। যেমন রমজান মাসের রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করলে কাফফারা হিসাবে দাস মুক্ত করতে হবে। কসম ভঙ্গ করলে দাস মুক্ত করতে হবে। কাউকে হত্যা করলে দাস মুক্ত করতে হবে ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি:

যে সকল কারণে মানুষ মানুষকে দাস বানায় ইসলামে তা হারাম তথা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন যুদ্ধে যারা বন্দি হয় তাদেরকে ইসলামে দাস বানানো নিষেধ করা হয়েছে। কাফের মুশরিকরা যুদ্ধে পরাজিত মুসলমানদেরকে দাস বানিয়ে রাখত। কিন্তু ইসলাম সেই প্রথাকে বাদ দিয়ে বন্দি বিনিময় প্রথা চালু করেছে। যেমন: রাসূল(সা.) বদরের যুদ্ধে পরাজিত কাফের মুশরিকদেরকে মুসলমানদের সাক্ষরতা শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

অতএব তোমরা যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করবে, তখন তাদেরকে

৩৪। উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৭, হাদিস- ৩;

শক্তভাবে বেঁধে নাও। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, আর না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর।[১]

সুতরাং ইসলামে দাস মুক্তির জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং দাস হিসেবে মানুষ কেনাবেচাকে কঠোরভাবে নিন্দা জানানো হয়েছে।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং দাস-দাসী

ইসলামের পূর্বে এবং ইসলাম আসার পরও কিছুদিনযাবৎ দাসপ্রথা এবং তাদের কেনাবেচার প্রচলন ছিল। মোটকথা দাস কেনাবেচা একটি সাধারন বিষয় ছিল। মানুষ তাদের খেদমতের জন্য বাড়িতে কৃতদাস রাখত। আর বিশেষ করে যারা ধনী ছিল তাদের মধ্যে এই বিষয়টি বেশী পরিলক্ষিত হত।

ইমাম সাজ্জাদের যুগেও মুসলমানদের মধ্যে প্রচুর দাস ছিল। তখন মুসলমানদের একের পর এক বিজয়ের কারণে মুসলমানদের কাছে প্রচুর দাস ছিল। আব্দুল মালেক বিন মারোয়ান এবং তার পুত্র ওলিদ বিন আব্দুল মালেক হিজাজে এবং যুবায়েরের সন্তান ইরাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম রাষ্ট্র আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে এবং প্রচুর গনিমত ও ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

অন্যদিকে আন্দালুসে হযরত সুলাইমানের প্রাসাদসহ অনেক দেশ ইসলামী ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়ে যায়। আর যারা ধনী ছিল তারা আরও ধনী হয়ে ওঠে, কেননা বাইতুলমাল থেকে নিয়মিত অর্থ এবং উপহার তাদের নিকট অহরহ আসতে থাকে।

এ সকল রাষ্ট্র বিজয় করার পর ৬০ হাজার বন্দি মুসলমানদের অধিনে চলে আসে এবং তারা মুসলমানদের দাস-দাসী হিসেবে জীবন-যাপন করতে থাকে। ইবনে আছির বলেন: এ সকল দেশ বিজয়ের পর ৬৫ হাজার মানুষ মুসলমানদের নিকট বন্দি হয়। যা এর পূর্বে আর কোথাও দেখা যায় নি।[২]

অন্য ঐতিহাসিকরা বলেছেন, যখন মুসলিম সৈন্যরা দামেস্কে ফিরে আসে তখন তাদের সাথে ১ হাজার বন্দি যুবতী ছিল।

এভাবে বন্দি যত বাড়তে থাকে মুসলমানদের নিকট দাস-দাসীও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলে ইসলামী নৈতিকতা, প্রশিক্ষণ ও সভ্যতায় নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। যার প্রতিকার ইসলামকে রক্ষা করার জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

৩৫। সূরা মুহাম্মাদ-৪

৩৬। মৌসুয়াতু ইমাম যাইনুল আবেদিন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭৭।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ওই সকল দাস-দাসীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন এবং ইসলামী মূল্যবোধকে তাদের সামনে তুলে ধরলেন, ফলে পরবর্তীতে তাদের মধ্য থেকে অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়।

মুসলমানদের আরও একটি বড় সমস্যা হল তারা দাস-দাসীদের সাথে বিবাহ করাকে অপছন্দ করত এবং মন্দ কাজ মনে করত, যেটা মদিনাতেও ছিল।

সমাজে দাস-দাসীদের মর্যাদা না থাকার কারণে মদিনার লোকেরাও তাদের সাথে বিবাহ করা এবং সন্তান নেয়াকে মন্দ কাজ মনে করত। কেননা তারা বিশ্বাস করত যে, আরবদের রক্তের সাথে অনারবদের রক্ত মিশে যাওয়াটা ঠিক হবে না। একারণেই দাস-দাসীদের সন্তানদেরকে সামাজিক মর্যাদা দেয়া হত না এবং এ অন্যায় প্রথা বহুদিন ধরে অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর মত মহান ব্যক্তিত্ব তাদের সামনে আসে তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে।

যেখানে উম্মে ওলাদের (দাসীর) সাথে বিবাহ করাকে অসম্মানের মনে করা হত সেখানে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) নিজে একজন উম্মে ওলাদ বা দাসির সাথে বিবাহ করেন। ইমাম আলী ইবনেল হুসাইন যাইনুল আবেদিনের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাকওয়া, ইবাদত-বন্দেগী এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাদের ভুল ধারণার অবসান ঘটায়। আর এভাবে ধীরে ধীরে সমাজে দাস-দাসিদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১]

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) সমাজ থেকে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করেন এবং নিজে রাসূল (সা.)-এর সন্তান এবং অতি উচ্চ বংশের মানুষ হওয়ার পরও দাসীর সাথে বিবাহ করেন এবং তার থেকে সন্তান গ্রহণ করেন। আর ধীরে ধীরে এ পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত হয়ে ওঠে।

দাস-দাসীদের সাথে সদাচার

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) দাস-দাসীদের সাথে কেমন আচরণ করতেন তা নিম্মের আলোচনা থেকে আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে যায়।

১। দাসদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) দাস-দাসীদেরকে ইসলামী সকল বিধিবিধান, নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে ইসলামী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাধীন করে দিতেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর এ আচরণ দাস-দাসীদের মধ্যে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, তারা সর্বদা ইমামের অনুসরণ করত এবং জান-পরান দিয়ে (মনেপ্রাণে) ইমামকে ভালবাসত। তারা ছিল ইমামত, বেলায়াত এবং আহলে বাইতের সমর্থক এবং তাদের আকিদা বিশ্বাসকেই তারা সমর্থন করত এবং তারা কখনোই ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর সাথে সামান্যতম বেয়াদবি করত না।

৩৭। তারিখে মাদিনা ওয়া দামেস্ক, ইবনে আসাকির, ২০তম খন্ড।

২। দাসীদের সাথে বিবাহ করা এবং তাদের থেকে সন্তান নেয়া

দাস-দাসীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তখনও জাহেলিয়াতের গন্ধ পাওয়া যেত। সমাজ থেকে এই অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারকে দূর করার জন্য ইমাম সাজ্জাদ (আ.) সকল মর্যাদার অধিকারী হয়েও দাসীর সাথে বিবাহ করেন। আর এর মাধ্যমে ইমাম ইসলামী মূল্যবোধকে রক্ষা করলেন এবং সমাজ থেকে গোত্র ও শ্রেণীবৈষম্য দূর করলেন।

উমাইয়্যারা এ কারণে ইমামের মর্যাদাকে খুন্ন করার সকল চেষ্টা চালায় কিন্তু ইমাম আল্লাহর নির্দেশ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না। বরং তাদের সকল চক্রান্তের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন।

মদিনার গভর্ণর আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান মদিনার ব্যক্তিত্বদের জন্য বিশেষ করে ইমাম সাজ্জাদের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিল। এ সকল গুপ্তচররা তাকে সংবাদ দিয়েছিল যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) দাসীর সাথে বিবাহ করেছেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) যখন তার দাসীকে মুক্তত করে বিবাহ করেন তখন খবর পেয়ে আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান ইমামকে এ ভাবে চিঠি লেখে:

আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি একজন দাসীর সাথে বিবাহ করেছেন। কিন্তু আপনি চাইলে কুরাইশ বংশের অনেক সম্মানিত নারীদের সাথে বিবাহ করতে পারতেন। যার ফলে আপনার মান-সম্মান আরও বৃদ্ধি পেত। আপনি নিজের মান-সম্মানের কথাও চিন্তা করলেন না এবং ভবিষ্যতে আপনার সন্তানদের মান সম্মানের কথাও চিন্তা করলেন না, - ওয়াস সালাম।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এ চিঠির জবাবে লিখলেন-

দাসীর সাথে বিবাহ করার জন্য তোমার নিন্দা জানানো চিঠি আমি পেয়েছি। যেখানে তুমি আমাকে আমার নিজের এবং সন্তানদের সম্মানের কথা ভেবে কুরাইশ বংশের কোন সম্ভ্রান্ত নারীর সাথে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছ। কিন্তু জেনে রাখ! আমি দাস মুক্ত করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছি এবং সওয়াব পেয়েছি। এছাড়াও আমি দাসী বিবাহ করে রাসূলের সুন্নত পালন করেছি। আর এটাও মনেরেখ! ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে পাকপবিত্র ব্যক্তিদের মান সম্মান কোন ভাবেই কম হয় না। মহান আল্লাহ ইসলামকে সকল প্রকার হীনতা, নীচতা এবং অপমান থেকে মুক্তির মাধ্যম বানিয়েছেন। সকল নিন্দা এবং ধিক্কার জাহেলদের চিন্তা চেতনা এবং কুসংস্কারের উপর,- ওয়াস সালাম।

আব্দুল মালেক ইমামের চিঠি পড়ে তার ছেলের দিকে ছুড়ে মারল। আব্দুল মালেকের পুত্র চিটিটা পড়ে বলল, ইমাম সাজ্জাদ অত্যন্ত কড়া ভাষায় এবং অহঙ্কারের সাথে তোমার চিঠির জবাব দিয়েছেন।

আব্দুল মালেক বলল: এভাবে বলনা, এরা হচ্ছে নবীর আহলে বাইত তারা যখন কথা বলে তখন তাদের মুখ থেকে এমন জ্ঞান বের হয় যা ঢেউয়ের মত সবকিছু ধুয়ে নিয়ে যায়।

আর তা সকল কলুষিত অন্তরকে ধুয়ে মুছে পাক করে দিতে পারে। ইমাম সাজ্জাদের সম্মানের সামনে সকলেই মাথা নত করতে বাধ্য।[১]

যাইদ বিন আলী এবং হিশাম বিন আব্দুল মালেকের সাথে সাক্ষাতে কিছু তিক্ত কথার আদান প্রদান হয়। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, যাইদ বিন আলী যখন হিশাম বিন আব্দুল মালেকের সাথে সাক্ষাতের জন্য যান তখন তার লোকেরা তাকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং সাক্ষাত করতে বাধা দেয়।

তখন যাইদ বিন আলী বলেন: আল্লাহর নিকট তাকওয়াবান ব্যক্তিরাই হচ্ছে সর্বোত্তম এবং যাদের তাকওয়া নেই আল্লাহর নিকট তাদের কোন সম্মানও নেই। আমি তোমাদেরকে নসিহত করছি যে, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাক এবং মুত্তাকি পরহেজগার হও।

হিশাম বলল: তুমি নিজেকে খেলাফতের হকদার মনে কর এবং খেলাফতের আশা কর? হে দাসীর সন্তান! তোমরা কবে থেকে খেলাফতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ।

যাইদ বিন আলী বললেন: আল্লাহর নিকট তার নির্বাচিত নবীদের থেকে সম্মানিত আর কেউ নেই। আর তাদের (নবীদের) মধ্যেও অনেকেই দাসীর সন্তান ছিলেন। যদি দাসীর সন্তান হওয়া নবুয়্যতের মর্যাদার জন্য ত্রুটি হত তাহলে মহান আল্লাহ কখনোই হযরত (দাসী হাজেরার সন্তান) ইসমাঈলকে নবী হিসাবে নির্বাচন করতেন না। হে হিশাম! তুমি বল আল্লাহর নিকট নবুয়্যতের মর্যাদা বেশী নাকি খেলাফতের মর্যাদা? আর আমার মর্যাদার কথা আর কিই বা বলব যার পূর্বপুরুষ হচ্ছেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং শেরে খোদা হযরত আলী (আ.)। [২]

উমাইয়্যাদের সাথে ইমাম সাজ্জাদ তথা আহলে বাইতের প্রধান পার্থক্য হল তারা জাহেলিয়াতের আদর্শ অনুসরণ করে আর আহলে বাইতের ইমামগণ (আ.) অনুসরণ করেন ইসলামের সঠিক নির্দেশের। উমাইয়্যারা ছিল জাহেলিয়াত ও কুসংস্কারের অনুসারী। আর ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ও তার সন্তান যাইদ ছিলেন ইসলামী শিক্ষা, নৈতিকতা এবং আদর্শের পতাকাবাহী।

৩। দাসদের ক্ষমা করে দিতেন

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) দাস-দাসীদের ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের সাথে খুব নমনীয় আচরণ করতেন। যার নমুনা ইতিহাসে বহু রয়েছে।

১- ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তার দাসকে কোন স্থান নির্মাণের নির্দেশ দেন। কিন্তু ওই দাস অবহেলা করে বড় ক্ষতি করে ফেলে। ইমাম রাগান্বিত হয়ে তাকে খুব আস্তে একটি চাবুকের আঘাত করেন। কিন্তু পরক্ষণই ইমাম অত্যন্ত কষ্ট পান যে কেন এই কাজ করলাম।

৩৮। ফরুয়ে কাফী শেইখ কুলাইন, ৩য় খণ্ড পৃ: ৩৪৮;
৩৯। বিহারুল আনওয়ার ৪৭ তম খণ্ড, পৃ: ১৮৭;

ইমাম বাড়ি ফিরে গিয়ে দাসকে ডাকলেন। দাস বাসায় গিয়ে দেখল ইমাম খালি গায়ে বসে আছেন। সে মনে করল ইমাম হয়ত তাকে আরও বেশী শাস্তি দেয়ার জন্য ডেকেছেন। ইমাম সাজ্জাদ (আ.) চাবুক ঐ দাসের হাতে দিয়ে বললেন: আজ আমি যেভাবে তোমাকে মেরেছি তুমিইও ঠিক সেভাবেই আমাকে এই চাবুক দিয়ে মার।

দাস বলল: হে ইমাম! আমি তো মনে করছিলাম যে আপনি আমাকে আরও বেশী শাস্তি দিবেন। আর আমি আরও বেশী শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য, কেননা আমি আপনার অনেক বড় ক্ষতি করে দিয়েছি। আমি কিভাবে আপনার থেকে প্রতিশোধ নেব?

ইমাম বললেন: তুমি কেন বুঝছোনা? আমি চাই যে তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নাও।

ইমাম আবারও বললেন: যাও তোমাকে আমি মুক্ত করে দিলাম। আর এ কথা ইমাম কয়েকবার বললেন। কিন্তু সে যখন কিছুতেই রাজি হল না, ইমাম তাকে বললেন: তাহলে

আমার এ বাড়ি আমি তোমাকে সদকা দিয়ে দিলাম। আর এভাবে ইমাম তার বাড়িকে ওই দাসকে দান করে দিলেন। [১]

২- একদা ইমাম সাজ্জাদের এক দাসী বদনা দিয়ে পানি ঢালছিল এবং ইমাম ওজু করছিলেন। হঠাৎ বদনাটি দাসীর হাত থেকে ছুটে গিয়ে ইমামের গায়ে পড়ল এবং তিনি একটু আহত হলেন। ইমাম যখন দাসীর দিকে তাকালেন তখন সে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করল:

وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ

যারা ক্রোধ সংবরণকারী।

ইমাম বললেন: আমি ক্রোধ সংবরণ করলাম।

দাসী আবার বলল:

وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ

এবং যারা মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।

ইমাম বললেন: আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

দাসী বলল:

وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

ইমাম বললেন: আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।

৪০। মুসতাদরাকুল ওসায়েল, নুরি তাবারসি, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ২৮৮;

৩- বর্ণিত আছে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তাঁর দাসকে দু'বার ডাকলেন কিন্তু সে জবাব দিলনা। তৃতীয়বার ডাকার পর জবাব দিলে ইমাম তাকে বললেন: হে বৎস! তুমি কি আমার কথা শুনতে পাও নি?

দাস জবাব দিল: হ্যাঁ শুনেছি।

ইমাম বললেন: তাহলে জবাব দিলেনা কেন?

দাস জাবাব দিল: কারণ আমি আপনার আচরণ সম্পর্কে অবগত আছি। আমি জানি যে, আমি যদি জবাব দিতে দেরিও করি তারপরও আপনি আমাকে কোন শাস্তি দিবেন না।

ইমাম বললেন: আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, আমার দাসরাও আমাকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে জানে। [১]

দাস দাসীদের সাথে ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর এমন আচরণ তাঁর দয়া, মহানুভবতা, ক্ষমা এবং সদাচারের পরিচয় বহন করে। যা তিনি তার পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শিখেছেন। আর এ আচরণ মহানবীর (সা.) আহলে বাইত ছাড়া অন্য কারও মধ্যে পাওয়া যাবে না।

৪। দাস-দাসীদের মুক্ত করে দিতেন

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) দাস দাসিদেরকে মুক্ত করে দিতেন। বছরে একবার সওয়াবের জন্য এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার জন্য ইমাম দাস-দাসীদের মুক্ত করে দিতেন। যার মাধ্যমে মানুষ সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে এবং অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বহু দাস-দাসী ক্রয় করে রাখতেন এবং তাদেরকে নৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্ত করে দিতেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন:

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) প্রতি বছর রমজান মাসের শেষে ২০ জন দাস-দাসীকে মুক্ত করতেন।[২]

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তাঁর অনুপম আচরণের মাধ্যমে অসংখ্য দাস-দাসীর জীবণকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর সমাজে তাদেরকে উচ্চ সম্মানের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। ইমামের এ সুন্দর আচরণ তাদের মননে এমন সুন্দর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তারা সকলেই ইমামের এবং আহলে বাইতের ভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

৪১। তারিখে মাদিনাতু দামেস্ক, ইবনে আসাকির, ৪১তম খণ্ড, পৃ: ৩৮৭;
৪২। মৌসূয়াতু ইমাম যাইনুল আবেদিন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮১;

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং ফকিরদের সাহায্য সহযোগিতা

ফকির মিসকিনদের সাথে ইমাম সাজ্জাদের আচরণ মানবতার জন্য আদর্শ ছিল। ইমাম বিভিন্নভাবে ফকির মিসকিন ও গরিব অসহায়দের সাহায্য করতেন, যার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হল:

১- ফকিরদের সাথে সদাচার

ক) ফকিরদের সম্মান করা

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ফকিরদের সাথে নমনীয় আচরণ করতেন এবং তাদের আবেগ অনুভুতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। ইমাম যখন ফকিরকে সাহায্য দিতেন তখন তার হাতে চুমু খেতেন যাতে সে লজ্জিত না হয় এবং নিজেকে ছোট মনে না করে। নিজেই তাদেরকে স্বাগত জানাতেন এবং তাদেরকে বলতেন: হে আমার! আখিরাতের সঞ্চয়, তোমাদেরকে স্বাগতম।

খ) গরিবদের সাথে নমনীয় আচরণ

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) গরিব ও ফকিরদেরকে অধিক ভালবাসতেন। তিনি ফকীর মিসকিন ও অসহায়দের সাথে একসাথে বসে খাবার খেতেন। তিনি এ কাজে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করতেন। তিনি নিজের হাতে ইয়াতিমদেরকে খাইয়ে দিতেন। তিনি এমনকি তাদের বাড়িতেও খাদ্যখাবার পৌঁছে দিতেন। তিনি ফকির মিসকিনদেরকে এতই ভালবাসতেন যে নিজের গাছের পাকা খেজুর না পেড়ে ওই সকল গরীবদের জন্য রেখে দিতেন যাতে তারা রাতের আধারে সেগুলো কুঁড়িয়ে নিতে পারে।

একদা ইমামের এক দাস রাতের বেলা খেজুর পেড়ে আনলে ইমাম তাকে বলেন: তুমি কি জান না যে রাসূল (সা.) বলেছেন, রাতের বেলা ফল এবং খেজুর পাড়তে হয় না। তিনি আরও বলেন: ফসল তোলার সময় অবশ্যই গরিবদেরকে দিবে। কেননা ওই ফসলে তাদের হক (অধিকার) রয়েছে। [১]

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর দস্তরখানায় যখন ফকির, মিসকিন এবং অসহায় লোকরা বসত ইমাম অত্যন্ত খুশি হতেন। ইমাম নিজের হাতে তাদেরকে খাবার তুলে দিতেন এবং তাদের বাড়ির সবার জন্যও খাবার দিয়ে দিতেন। তিনি সর্বদা খাওয়ার পূর্বে সদকা দিতেন। আলতাকি বলেন: ইমাম আলী ইবনিল হুসাইন যাইনুল আবেদিন সদকা দেয়ার পূর্বে তাতে চুমু খেতেন। [২]

৪৩। নাফাহাত মিন সিরাতু আইম্মাহ আহলি বাইত, বাকের শারীফ কুরাইশি, পৃ: ১

৪৪। মানাকিবে আলে আবি তালিব, ইবনে শাহরে আশুব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৭।

গ) সাহায্য প্রার্থিকে (ভিক্ষুক) কখনোই তাড়িয়ে দিতেন না

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করতেন। কেননা এর পরিণাম কখনোই ভাল হয় না। ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দিলে মানুষের নেয়ামত ও বরকত দূর হয়ে যায়, আকস্মিক সমস্যা ও মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়। সাইদ বিন মুসাইয়্যেব বলেন: আমি একদা ইমামের কাছে ছিলাম, ইমাম যোহরের নামাজ পড়ছিলেন এমন সময় এক ফকির তাঁর বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে আসল। ইমাম বললেন: তার চাহিদা পূরণ কর এবং কখনোই ভিক্ষুককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিবে না। [১]

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বহু রেওয়ায়েতে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন।

কোন সাহায্য প্রার্থিকে তার প্রয়োজন না মিটিয়ে তাড়িয়ে দিলে তার নেয়ামত দূর হয়ে যায় এবং তার উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়।

ইমামগণ থেকে বর্ণিত বহু হাদিস থেকে ফকিরদের সাহায্য করার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যারা চায় তাদের উপর আল্লাহর নেয়ামত অব্যাহতভাবে আসতে থাকুক সে যেন কোন ফকিরকে তাড়িয়ে না দেয় এবং আল্লাহর দেয়া নেয়ামত থেকে তাকে বঞ্চিত না করে। [২]

২। দেনাদারের দেনা পরিশোধ করা

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি দেনাদারদের দেনা পরিশোধ করে দিতেন। তাই সে দেনার পরিমাণ যতই বেশী হোক না কেন। ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যা থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মুহাম্মাদ বিন ওসামা বিন যাইদের সাক্ষাতে গেলেন। সে ইমামকে দেখে ক্রন্দন করতে শুরু করল, ইমাম তার কাছে কারণ জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমি মানুষের কাছে অনেক ঋনি। ইমাম বললেন: তোমার ঋনের পরিমাণ কত? সে বলল: ১৫ হাজার দেরহাম। ইমাম বললেন: তোমার দেনা আমি পরিশোধ করে দেব। [৩]

এভাবে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মুহাম্মাদ বিন ওসামার সমস্যার সমাধান করলেন এবং তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগেই তার দেনা পরিশোধ করে দিলেন।

৩। গরিবদের গণহারে খাওয়াতেন

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর দানশীলতার আরেকটি নমুনা হচ্ছে তিনি মদিনায় প্রতিদিন দুপুরে মানুষকে গণহারে খাওয়াতেন। [৪]

৪৫। ফুরুয়ে কাফি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮; আল ওয়াফি, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪১১;
৪৬। নাফাহাত মিন সিরাতু আইম্মাহ আহলি বাইত, বাকের শারীফ কুরাইশি, পৃ: ১৮৪;
৪৭। মানাকিবে আলে আবি তালিব, ইবনে শাহরে আশুব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৭।
৪৮। নাফাহাত মিন সিরাতু আইম্মাহ আহলি বাইত, বাকের শারীফ কুরাইশি, পৃ: ১৮২;

৪। গরিবদের দায়িত্ব নিতেন

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর মহানুভবতার আরেকটি নমুনা হচ্ছে তিনি মদিনার ১০০ পরিবারকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকের পরিবারের লোকসংখ্যাও অনেক ছিল। [১]

৫। গোপনে সাহায্য করা

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মদিনার যে সকল গরিব অসহায়দের সাহায্য করতেন তারা নিজেও জানত না যে ইমাম তাদের সাহায্য করছেন। ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর শাহাদাতের পর তারা বুঝতে পেরেছিল যে রাতের আঁধারে যিনি আমাদের জন্য সাহায্য নিয়ে আসতেন তিনিই হলেন ইমাম সাজ্জাদ (আ.)। [২]

আহমাদ বিন হাম্বাল মোয়াম্মার বিন শাইবা বিন নোয়ামা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ১০০টি পরিবারকে সাহায্য করতেন এবং প্রতিটি পরিবারের সদস্যও অনেক ছিল। হিলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থের লেখক আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন যে, গোপনে দান করা কাকে বলে তা মদিনা বাসীরা জানত না। ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর শাহাদাতের পর তারা বুঝতে পেরেছিল যে, গোপনে সদকা দান কাকে বলে। [৩]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, মদিনা মুনাওয়ারায় এমনকিছু ঘর ছিল যাদের নিকট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রতি রাতে পৌঁছে যেত। কিন্তু তারা জানত না যে তা কোথা থেকে আসে বা কে দেয়। ইমাম সাজ্জাদের (আ.) শাহাদাতের পর যখন তারা জানতে পারল তখন তারা আছাড় খেয়ে কাদতে শুরু করল।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) রাতের আঁধারে গরিবদের জন্য বস্তাভরা খাবার নিজের কাঁধে নিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

যারা ইমামের বাড়িতে সাহায্য নিতে আসত, ইমাম তাদেরকেও সাহায্য দিতেন এবং দেওয়ার সময় ইমাম রুমাল দিয়ে নিজে মুখ ঢেকে নিতেন যাতে ফকির ইমামকে চিনতে না পারে।

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাতের বেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত তখন ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বস্তার মধ্যে খাবার নিয়ে অসহায়দের সাহায্য করার জন্য বের হতেন। তিনি বস্তা কাঁধে নিয়ে লোকদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিতেন। এসময়ে ইমাম রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন। ইমাম যেহেতু প্রতি রাতে গরিবদের ঘরে খাবার পৌঁছে দিতেন

৪৯। মানাকিবে আলে আবি তালিব, ইবনে শাহরে আশুব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৭।
৫০। মিফাতুস সাফাভি ইবনে জৌজি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৭;
৫১। মানাকিবে আলে আবি তালিব, ইবনে শাহরে আশুব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৭।

তাই অনেকেই রাতের বেলায় ইমামের আসার অপেক্ষায় থাকত। আর ইমামকে দেখেই আনন্দে বলে উঠত বস্তা ওয়ালা এসে গেছে। [১]

আবি আইনা আবি হামজা ছুমালি থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) রাতের আঁধারে খাবার নিয়ে গরিবদুঃখিদের মাঝে বিলাতেন এবং বলতেন: রাতের আঁধারে সদকা দিলে আল্লাহর গজব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। [২]

আবু নাইম ইস্পাহানি বলেন: গোপনে সদকা দান করা আল্লাহর গজবকে (ক্রোধকে) দূর করে।[৩]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, মদিনার গরিব দুঃখিদের বাড়িতে রাতের আঁধারে খাবার পৌছে যেত, কিন্তু তারা জানত না যে এই খাদ্য কোথাথেকে আসে। ইমামের শাহাদাতের পর তারা বুঝতে পেরেছিল যে, রাতের আঁধারে তাদের বাড়িতে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) খাদ্য ও পানি পৌঁছে দিতেন।

জাহরি বলেন, ইমাম সাজ্জাদের শাহাদাতের পর তাকে যখন গোসল দেয়া হয় তখন তার পিঠে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি ইমাম সাজ্জাদ প্রতি রাতে যে বস্তা পিঠে নিয়ে গরিবদের সাহায্য করতেন এটা হচ্ছে সেই বোঝার দাগ।

উমার বিন ছাবেত বলেন: যখন ইমাম সাজ্জাদ (আ.) -কে গোসল দেয়া হয়, তখন তাঁর পিঠে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়, সবাই জিজ্ঞাস করল, এটা কিসের দাগ, পরিবারের লোকেরা বললেন, এটা হচ্ছে সেই বোঝার দাগ যা তিনি প্রতিরাতে গরিবদের জন্য বহন করে নিয়ে যেতেন।

আরও শিয়া সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামকে গোসল দেয়ার সময় তার পিঠে দাগ এবং উঁচু মাংস দেখা যায়, যা ছিল ফকিরদের জন্য রাতের আধারে বস্তাভর্তি খাবারের দাগ।

গরিবদের সাথে ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর আচরণ এতটাই ভাল ও মধুর ছিল যে, তিনি কখনোই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন নি।

ইমামের এ আচরণ আমাদের সবার জন্য একটি বড় শিক্ষা যে, কিভাবে গরীব এবং অসহায়দের সাহায্য করা উচিত। যার ফলে সমাজ উন্নত হতে পারে।

৫২। মানাকিবে আলে আবি তালিব, ইবনে শাহরে আশুব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৭;
৫৩। সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮১;
৫৪। হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৪১৭;

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থ

সমাজের উন্নতির জন্য ইমাম সাজ্জাদের রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থ জ্ঞানের একটি বিশাল ভান্ডার। এ গ্রন্থে ইমাম মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মানবাধিকার সংস্থারও হাজার বছর পূর্বে মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছেন। যা থেকে বোঝা যায় যে মানবাধিকারের বিষয়ে ইমাম সাজ্জাদের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা গভীর ও সুক্ষ ছিল।

সাহিফায়ে সাজ্জাদিয়ার পর ইমাম সাজ্জাদের রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থটি অত্যান্ত মূল্যবাণ ও চমৎকার গ্রন্থ। ইমাম সাজ্জাদ এই গ্রন্থ আল্লাহর প্রতি মানুষের কি দায়িত্ব, নিজের প্রতি কি দায়িত্ব এবং অন্যের প্রতি কি দায়িত্ব তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে শোবা হাররানি তার তোহাফুল উকুল গ্রন্থে ৫০টি অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু শেইখ সাদুক তার খিসাল গ্রন্থে ৫১টি অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সাজ্জাদ এবং মানবাধিকারের মূল ভিত্তসমূহ

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মানবাধিকারের জনক। চৌদ্দশত বছরের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি মানবাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি জানতেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজ উন্নতির মুখ দেখতে পারবে না। তিনি জানতেন যে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। সামাজিক ও ব্যক্তিগত ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য মানবাধিকার থাকা একান্ত জরুরী। আমরা যদি অন্যের অধিকারকে মূল্যায়ন ও সম্মান করতে পারি তাহলেই সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইমাম সাজ্জাদের রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থটি শিক্ষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে তাহলেই মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে এবং পরস্পরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

সমাজে যদি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকলেই পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং একে অপরের অধিকার মেনে চলে তাহলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। সুতরাং সমাজের সকলকে নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে এবং পরস্পরকে সম্মান দিতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে মানুষের অধিকার এবং সম্মান সম্পর্কে ইরশাদ করছেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

আর অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে (মানুষকে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষকে মানুষ হিসেবে (তার ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং বংশ উল্লেখ করা ছাড়াই) সম্মানিত করেছেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) কারবালার মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনার পর এ রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থটি লিখেছেন। যে ঘটনায় মানুষের শুধু অধিকারই নয় বরং সবধরণের সম্মান ও মর্যাদাকে লুণ্ঠন করা হয়েছিল। ইমাম মানবাধিকার এবং মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ গ্রন্থ রচনা করেন।

রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থের বৈশিষ্ট এবং মর্যাদা

রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে, ইতিপূর্বে এমন কোন মানবাধিকার গ্রন্থ, রচিত হয় নি। সুতরাং এটিই হচ্ছে বিশ্বের সর্বপ্রথম মানবাধিকার গ্রন্থ। বর্তমানের যে মানবাধিকার আইন তা মাত্র ২০০ বছর আগে রচিত হয়েছে। বর্তমানের যে মানবাধিকার সংস্থার আইন তা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়। আর এটাকে নেয়া হয় ফ্রান্সের ১৬৮৯ সালের মানবাধিকার আইন থেকে। যার মধ্যে সামান্য কয়েকটি মানবিক তথা মানবাধিকার আইন দেখতে পাওয়া যায়।

মানবাধিকার সংক্রান্ত সকল গ্রন্থ, নীতিমালা এবং নির্দেশের উপর ইমাম সাজ্জাদ(আ.)-এর রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে এ গ্রন্থটিতে বহু আইন এবং অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থে মানুষের ৫১টি মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মানবাধিকার সংস্থার অধিকারের সংখ্যা মাত্র ২৯টি। এর মূল কারণ হচ্ছে তারা অনেক কিছুর মৌলিক অধিকারকে বাদ দিয়েছে। যেমন আল্লাহর প্রতি মানুষের অধিকার যা হচ্ছে সকল অধিকারে মূল বা শিরোমণি।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) শুধু আল্লাহর প্রতি মানুষের কি হক বা অধিকার আছে সেটা বলেই ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি এটাও বলেছেন যে, মানুষের নিজের প্রতি নিজের কি কি অধিকার রয়েছে।

৫৫। সূরা ইসরা-৭০

মৌলিক অধিকারসমূহ

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তাঁর রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থে মানুষের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন: হাক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর অধিকার, হাক্কুন নাফস তথা নিজের প্রতি নিজের অধিকার বা কর্তব্য। এছাড়াও অন্য মানুষ এবং জিনিসের প্রতি মানূষের কি কর্তব্য রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন।

নিম্নে রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থের অধিকারের সূচী উল্লেখ করা হলঃ

১। খালেক এবং মাখলুকের অধিকার (সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির অধিকার)।

২। শরীর তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিকার। যেমন: নাক, কান, হাত, পা, চোখ, পেট, লজ্জাস্থান ইত্যাদির হক বা অধিকার।

৩। কাজ এবং ইবাদতের অধিকার। যেমন: নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, সদকা, হেদায়েত ইত্যাদি।

৪। নবী এবং ইমামদের অধিকার। যেমন: ইসলামী মনীষী এবং শাসকদের অধিকার।

৫। প্রজা এবং অধীনস্তদের অধিকার। যেমন: প্রজা, ছাত্র-ছাত্রী, স্ত্রী, দাস-দাসীদের অধিকার।

৬। আত্মীয়স্বজনদের অধিকার। যেমন: পিতা-মাতার অধিকার, ভাই-বোনের অধিকার, সন্তানের অধিকার, প্রভু এবং দাসের অধিকার ইত্যাদি।

৭। আলেম এবং অন্যদের অধিকার। যেমন: মুয়াজ্জেনের অধিকার, ইমাম জামাতের অধিকার, সহচরের অধিকার, বন্ধুর অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, অংশীদার এবং পার্টনারের অধিকার, বড়দের অধিকার, ছোটদের অধিকার, মুসলমানের অধিকার, কাফেরে-জিম্মির অধিকার ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় হল যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) শেষে মুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মুসলমানরা যে মাজহাবেরই অনুসারী হোক না কেন তারা তাদের নিজস্ব মাজহাবের বিধিবিধান পালন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। মুসলমানদের পর ইমাম সাজ্জাদ (আ.) একটি রাষ্টের সকল মানুষের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাদের ধর্ম এবং বিশ্বাস যাই হোক না কেন মানুষ হিসেবে রাষ্টের কাছে তাদের সমান অধিকার রয়েছে। সুতরাং একটি দেশের নাগরিক হিসেবে সে সকল অধিকার পাবে এবং তার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডসহ সকল কিছু স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। নাগরিক হিসেবে তাদের নিজের ধর্ম অনুযায়ী বিবাহ, তালাক, ইবাদত সকল কিছু পালন করার পরিপূর্ণ অধিকার রাখে। এজন্য ইমাম সাজ্জাদ (আ.) কাফিরে-জিম্মিদের সম্পর্কে বলেছেন: আল্লাহ তাদেরকে যে

ছাড় দিয়েছেন তোমরাও তাদেরকে সেই ছাড় দাও এবং সে যতক্ষণ তার চুক্তি ভঙ্গ না করবে তার সাথে কঠোর আচরণ কর না। [১]

রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থটি একটি ঐতিহাসিক সম্পদ এবং এটার উপর আরও বেশী গবেষণা ও আলোচনা হওয়া একান্ত জরুরী। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আহলে বাইত (আ.) চিন্তা চেতনার কত উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করতেন এবং তাঁদের আখলাক চরিত্র সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গিন ছিল।

রিসলাতুল হুকুক এবং সমাজের ন্যায় ও ইনসাফ

ইসলামী সমাজের সব থেকে বড় এবং মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের জন্য এমন আইন থাকতে হবে যার ভিত্তিতে সকলেই মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আর সকল ঐশী ধর্ম এবং শরীয়তের ভিত্তিও এটাই ছিল। রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সম্পর্ক এবং অধিকারে এটাই স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সকল আহকামের দর্শন হচ্ছে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে যেন পারস্পরিক সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়।

সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য প্রত্যেককে পারস্পরিক সম্মান দিতে হবে এবং সবাইকে সবার অধিকারের প্রতি স্রদ্ধাশীল হতে হবে। আর সকল শরীয়তের বিধিবিধানও এই অধিকারের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এ প্রয়োজনকে দৃষ্টিতে রেখেই ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এমন একটি মানবাধিকারের গ্রন্থ রচনা করেছেন যা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থের শুরুতেই ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এটা স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষের জীবন এমনকিছু অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ যার পরিচিতি অর্জন করা সবার জন্য ওয়াজিব। এরপর আল্লাহর অধিকারের কথা বলা হয়েছে যা কি না সবথেকে বড় অধিকার। এরপর এ সকল অধিকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাক্কুন নাফসে ইমাম এটা স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষের নিজের প্রতি তার কি কি দায়িত্ব রয়েছে এবং নিজের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিৎ। এরপর হাক্কুন নাস তথা মানবাধিকার বা অন্যের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ইমাম শাসক এবং প্রজার অধিকার, আত্মিয়স্বজনের অধিকার, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে ইমাম অন্যদের অধিকারের কথাও বলেছেন যেমন: মুয়াজ্জিনের অধিকার, ইমাম জামায়াতের অধিকার, সহচরের অধিকার, অংশিদারের অধিকার, দেনাদারের অধিকার, শত্রুর অধিকার, পরামর্শকারী এবং পরামর্শদাতার অধিকার, নসিহতকারী এবং নসিহত গ্রহণকারীর অধিকার, দাতা এবং গ্রহিতার অধিকার এবং ছোট ও বড়দের অধিকার ইত্যাদি। এছাড়াও ইমাম কাফিরে-জিম্মি এবং মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের অধিকার সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৫৫। আল ওয়াফি ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩৪;

আমাদের কর্তব্য হল ইমাম সাজ্জাদের রিসালাতুল হুকুক গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া এবং এর শিক্ষাকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। যার ফলে সমাজের সকলেই সবার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

গ্রন্থপঞ্জি

১। কোরআন মাজিদ

২। ইবেন আছির, আবুল হাসান আইত বিন রাম, মোহাম্মাদ বিন মোহাম্মাদ বিন আর রাম ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ শাইবানি। (৬৩০ হিজরি), আল কামিল ফিত তারিখ, সম্পাদনা: মোহাম্মাদ ইউসুফ আর রেকাক, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন- চতুর্থ প্রকাশ ১৪২৪ হিজরি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

৩। ইবনে যৌজি, আবুল জারাজ, আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মোহাম্মাদ (৫৯৭ হিজরি), আত তানযিম ফি তারিখেল উমাম ওয়াল মুলুক, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত- লেবানন, প্রথম প্রকাশ -১৪১২ হিজরি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

৪। ইবনে যৌজি, আবুল জারাজ, আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মোহাম্মাদ (৫৯৭ হিজরি), গবেষণা, ড. আব্দুল হামিদ হিন্দাভি, মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত- লেবান) প্রকাশকাল: ১৪২৯ হিজরি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

৫। ইবনে কুতাইবা, আদ দাইনুরি, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মাজিদ ইবনে মুসলেম, ২৭৬ হিজরি, ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ। উয়ুনুল আখবার, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ- ১৪২৪ হিজরি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

৬। ইবনে শোবা আল হাররানি, আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আলী বিন হুসাইন, তুহাফুল উকুল আন আলে রাসূল, সম্পাদনা: আলী আকবার গাফফারি, মোয়াসসেসায়ে নাশরে ইসলামী, কোম, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪০৪ হিজরি।

৭। ইবনে তাউস, আবুল কাসেম আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফার ইবনে মুহাম্মাদ, ৬৬৪ হিজরি। মিনহাজুদ দাওয়াত ও মিনহাজুল ইবাদাত। বৈরুত- তৃতীয় প্রকাশ ১৪৩২ হিজরি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

৮। ইবনে আসাকির, আবুল কাসেম আলী ইবনেল হাসান ইবনে হেবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ দামেস্কি, ১১৭৬ হিজরি। তারিখে মাদিনাতু দামেস্ক, দারুল ফিকর বৈরুত- ১৪১৫ হিজরি।

৯। ইস্পাহানি, আবু নাইম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক বিন মুসা, ৪৩০ হিজরি, ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ। হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, গবেষণা: সামি আবু জাহিন, দারুল হাদিস, কায়রো, মিসর। ১৪৩০ হিজরি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

১০। মাহদি পিশওয়ায়ি, সিরাতুল আয়িম্মাতুল ইছনা আশার, দারুল কুতুবুল আরাবি লেবানন। প্রথম প্রকাশ ১৪২৬ হিজরি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।

১১। হুররে আমেলি, আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন আলী, ১১০৪ হিজরি; তাফসিলে ওসায়েলুশ শিয়া ইলা তাহসিলে মাসায়েলুশ শারিয়া, মোয়াসসেসায়ে আলুল

বাইত লেআহইয়ায়ে তুরাছ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৪১৩ হিজরি, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

১২। আল হুসাইনি, মোহসেন, মোয়াসসেসায়ে ইমাম যাইনুল আবেদিন, দারুল মুহাজ্জাতুল বাইজা, বৈরুত-লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪৩৫ হিজরি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

১৩। আয যাহাবি, শামসুদ্দিন, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ওছমান, ৭৪৮ হিজরি, সিয়ারু আলামুন নুবালা, মাকতাবাতুল আরাবিয়া, বৈরুত-লেবানন; প্রথম প্রকাশ, ১৪৩৫ হিজরি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

১৪। রেইশাহরি, মুহাম্মাদ, মিযানুল হিকমা, মোয়াসসেসায়ে দারুল হাদিছ আছ ছাকাফিয়া, বৈরুত-লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ হিজরি।

১৫। যাইনুল আবেদিন, ইমাম আলী ইবনেল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব, আস সাহিফাতুলস সাজ্জাদিয়া আল কামিলা, মোয়াসসেসা আল আলামি লিল মাতবুয়াত, বৈরুত-লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৪ হিজরি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

১৬। আশ শারিফ রাজি, আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন আমি আহমাদ আল হুসাইন ইবনে মুসা ইবনে মুহাম্মাদ, মুসা ইবনে ইব্রাহিম ইবনে ইমাম মুসা আল কাযিম; ৪০৬ হিজরি, ১০১৫ খ্রিস্টাব্দ। নাহজুল বালাগা, আল ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব, ব্যাখ্যা: শেইক মুহাম্মাদ আবদুহ, দারুল বালাগ, বৈরুত লেবানন; চতুর্থ প্রকাশ, ১৪০৯ হিজরি, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

১৭। আস সাদুক, আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে বাবেভেই আল কোম্মি, ৩৮১ হিজরি, আল আমালি, মোয়াসেসেয়ে বেয়ছাত, কো, প্রথম প্রকাশ ১০১৭ হিজরি,

১৮। আস সাদুক, আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে বাবেভেই আল কোম্মি, ৩৮১ হিজরি, খিসাল, মুয়াসসাসা আল আলামি লিল মাতবুয়াত, বৈরুত-লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪১০ হিজরি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ।

১৯। আত তাবারসি, মিরযা হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ তাকি ইবনে আলী মুহাম্মাদ বিন তাকি আন নুরি, ১৩২০ হিজরি, মুস্তাদরাকুল ওসায়েল ওয়া মুস্তাম্বাতুল মাসায়েল, দারুল হেদায়া, বৈরুত-লেবানন; পঞ্চম প্রকাশ , ১৪১২ হিজরি, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ।

২০। আত তাবারসি, আবু আলী ফাযল বিন হাসান, ৫৪৮ হিজরি, মাজমাউল বায়ান ফি তাফসিরেল কুরআন, দারুল মারেফাত, বৈরুত- লেবানন; প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬ হিজরি, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

২১। আত তাবারি, আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির বিন ইয়াযিদ বিন কাছির বিন গালিব, ৩১০ হিজরি, ৯২৩খ্রিস্টাব্দ, তারিখে তাবারি; তারিখে উমাম ওয়াল মুলুক, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত- লেবানন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪২৪ হিজরি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

২২। আল পৈইজ কাশানি, মুহাম্মাদ বিন মুর্তাজা, ১০৯১ হিজরি, কিতাব আল ওয়াফি; গবেষণা: সাইয়্যেদ আলী আব্দুল মোহসেন বাহরুল উলুম, দারুল আহইয়া তুরাছেল আরাবিয়া, বৈরুত-লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪৩২ হিজরি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

২৩। আল কারাশি, বাকের শারিফ, নাফাহাত মিন সিরাতে আইম্মাহ আহলিল বাইত, দারুল হুদা, কোম, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৪ হিজরি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

২৪। আল কুলাইনি, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব, ৩২৯ হিজরি; উসূলে কাফি, গবেষণা: শেইখ মুহাম্মাদ জাফার শামসুদ্দিন, দারুত তায়ারোফ লিলমাতবুয়াত, বৈরুত-লেবানন, ১৪১৯ হিজরি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ।

২৫। আল কুলাইনি, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব, ৩২৯ হিজরি; উসূলে কাফি, গবেষণা: শেইখ মুহাম্মাদ জাফার শমসুদ্দিন, দারুত তায়ারোফ লিলমাতবুয়াত, বৈরুত-লেবানন, ১৪১৩ হিজরি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

২৬। আল মুত্তাকি হিন্দি, আলাউদ্দিন আলী ইবনে হিসামুদ্দিন, ৯৭৫ হিজরি, ১৫৬৭খ্রিস্টাব্দ; কান্‌জুল উম্মাল ফি সুনানে আপওয়াল ওয়া আফয়াল; মুয়াসসাসায়ে আররাসায়া, বৈরুত-লেবানন, ১৪০৯ হিজরি, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

২৭। আল মাজলিসি, মুহাম্মাদ বাকের বিন মুহাম্মাদ তাকি, ১১১১ হিজরি, বিহারুল আনওয়ার লি দুরারে খাবারে আইম্মা আতহার, মোয়াসসেসায়ে আহলুল বাইত, কোম; চতুর্থ প্রকাশ, ১৪০৯ হিজরি, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

লেখক পরিচিত

আল্লামা ড. শেইখ আব্দুল্লাহ আহমাদ কাযেম মোহাম্মাদ ইউসুফ। তিনি সৌদি আরবের পূর্ব অঞ্চলের কাতিফের হিল্লাহ শহরে ১৩৮৩ হিজরি মোতাবেক ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বর্তমান সময়ের একজন বিশিষ্ট ইসলামী পন্ডিত এবং চিন্তাবিদ। তিনি ইরানের পবিত্র কোম শহরের বড় বড় আলেমদের নিকট অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতিও পেয়েছেন।

তিনি ১৪৩২ হিজরি মোতাবেক ২০১১ খ্রিস্টাব্দে আল মুস্তাফা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেকাহশাস্ত্রের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি নিজ দেশের কাতিফ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৪৩২ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত রাসূলের আজাম মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব গ্রহন করেন।

তিনি ফিকাহশাস্ত্র, কোরআন, ইসলামী সভ্যতার উপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও পারস্য উপসাগরীয় সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। তার মূল্যবান ব্যক্তিত্বের উপর অনেক বই, প্রবন্ধ এবং ওসেবসাইটে লেখা হয়েছে।

তিনি একজন স্বনামধন্য বক্তা এবং খতিব। তার আলোচনা এবং টকশো বিভিন্ন টেলিভিশন এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলে দেখা যায়।

তার লেখা ফেকাহ, কোরআন, ইতিহাস, ইসলামী চিন্তাধারা, যুব সমাজ নারী সমাজ, ওলামা এবং ইসলামী সমাজের উপর ৬৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান যুগের যুব সমাজ এবং নারী সমাজের উপর তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি অনেক বই লিখেছেন। যেমন: বর্তমান ও ভবিষ্যতে যুব সমাজের সমস্যা। যৌবন এবং যুগের চাহিদা, নারী এবং পরিবর্তনের যুগে তাদের চাহিদা ইত্যাদি বইয়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

তার লেখা মূল্যবান গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো সবই ইসলামী বিষয়ের উপরে যা জ্ঞানের মান উন্নয়ন বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত।

তার ইউটিউব লাইব্রেরী আছে, যাতে রয়েছে ৬০০ বেশী বক্তব্য এবং আলোচনা, যা তার শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে।

লেখকের ওয়েব সাইট থেকে তার সম্পর্কিত আরও মূল্যবান অনেক তথ্য আমরা জানতে পারব। www.alyousif.org

মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে আরও বেশী খেদমত করার তৌফিক দান করেন এবং তার লেখনি থেকে যেন ইসলাম ও মুসলমানদের অনেক বেশী উপকার হয়।

মো. আলী মোর্ত্তজা, বাংলাদেশ

লেখক : হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন
ড. মাওলানা আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ (কাতিফ)

অনুবাদক : হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন
আলহাজ্জ মাওলানা মো. আলী মোর্তজা (বাংলাদেশ)

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং মানবিক প্রশিক্ষণ

এই পরিস্থিতিতে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) কারবালার ঘটনার পর সমাজের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির জন্য সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় এবং ইসলামী সুশিক্ষার প্রচার শুরু করেন। তিনি পাশাপাশি এমন ছাত্র ও শিক্ষক তৈর করলেন যারা সমাজকে সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এছাড়াও তিনি সমাজের যারা জ্ঞানী শ্রেণীর লোক ছিলেন তাদের জন্যও উপযুক্ত খোরাক দিলেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর প্রশিক্ষণ ও খেদমতের মানদণ্ড ছিল মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং সঠিক ইসলামী প্রশিক্ষণ দান করা। কেননা উম্মতের উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে মানুষের সুশিক্ষা ও সঠিক প্রশিক্ষণ মুখ্য ভ'মিকা পালন করে।

মনুষ্য সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিস্তারে ইমাম সাজ্জাদের যে ভুমিকা তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ইমাম সাজ্জা (আ.) যে সকল বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন তার কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

১। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ (দোয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ)
২। মানবিক প্রশিক্ষণ (দাসদের প্রশিক্ষণ)
৩। সেবার প্রশিক্ষণ (গরিব, অসহায়দের সাহায্য সহযোগিতা করা)
৪। অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ (রিসালাতুল হুকুক)

আল্লাহুল মুসতায়ান
আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ
আল হিল্লা-আল কাতিফ
শুক্রবার, ৭ রমজান ১৪৩৮ হিজরি, ২ জুন ২০১৭ ইং